মার্কসবাদ ও
মানব সমাজের বিকাশ প্রসঙ্গে

বৈপ্লবিক কর্তব্য সম্পাদন এবং নিজেদের সর্বাত্মক মুক্তি অর্জন সফল করার জন্য সত্য জানার প্রয়োজন সর্বহারাশ্রেণীরই সবচেয়ে বেশি। বিজ্ঞানের নিয়মগুলিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানা ও জ্ঞানজগতের সকল শাখাকে ব্যাপ্ত করে এই জ্ঞানসাধনা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নিপীড়িত শোষিত জনগণেরই সবচেয়ে বেশি। একটি রাজনৈতিক শিক্ষাশিবিরে কৃষিমজুর ও চাষীদের উদ্দেশে প্রদত্ত এই ভাষণটি বস্তুবাদী চিন্তা ও মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজবিকাশের ধারার একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ। বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু স্তরে পুঁজিবাদ কীভাবে বিজ্ঞান ও সমাজের অপ্রতিহত বিকাশে বাধা সৃষ্টি করছে তা দেখাতে গিয়ে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শনের সাথে অন্যান্য দর্শনের মৌলিক পার্থক্য কোথায় তাও এই আলোচনার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

মার্কসবাদই হচ্ছে একমাত্র দর্শন, যা সত্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রে আমাদের সত্যিকারের সাহায্য করতে পারে। মার্কসবাদ ছাড়া অন্য কোন দর্শন বা মতবাদ সত্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে আলোকপাত করতে সক্ষম নয় বলেই আমরা মার্কসবাদকে গ্রহণ করি, মার্কসবাদ নিয়ে চর্চা করাকে এত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি এবং নিজেদের মার্কসবাদী বলে বলি। প্রচলিত অন্যান্য দর্শন বা মতবাদের সাথে মার্কসবাদের মৌলিক পার্থক্য এখানেই যে, অন্যান্য দর্শনগুলো জ্ঞানার্জনের জন্য যেখানে মানুষের ব্যক্তিমনীষা, চিন্তার ক্ষমতা বা বিশেষ কোন একজন দার্শনিকের চিন্তাশক্তি ও বিচারশক্তির ওপরই প্রধানত প্রাধান্য দিয়ে থাকে, সেখানে মার্কসবাদ জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বাস্তব অভিজ্ঞতা, ইতিহাস ও যুক্তিবিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করে। মার্কসবাদ মনে করে যে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বাস্তব অভিজ্ঞতা, ইতিহাস ও যুক্তিবিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান ব্যতিরেকে কোন জ্ঞান সঠিক জ্ঞানও নয় এবং কোন সত্যকে যথাযথভাবে জানাও সম্ভব নয়। সুতরাং সত্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোন মানুষের চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধির ওপরই শুধু নির্ভর করা চলে না। মানুষের চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধি তো নিশ্চয়ই দরকার — কিন্তু তার সাথে সাথে বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা মারফতই সত্যোপলব্ধি করতে হবে, সত্যকে নির্ধারণ করতে হবে। তাই মার্কসবাদ পুরোপুরি বিজ্ঞানধর্মী। কারণ, পরীক্ষালব্ধ সত্যই এর ভিত্তি — বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলোর ওপর এবং বৈজ্ঞানিক সত্যগুলোর ওপরই এর সমস্ত কাঠামোটা দাঁড়িয়ে আছে। মানুষের মনগড়া চিন্তা ও বিশ্লেষণের ওপর এর কাঠামোটা গড়ে ওঠেনি। অন্যান্য দর্শনগুলো যেখানে বিজ্ঞানের ওপর খবরদারি করতে চাইছে, বৈজ্ঞানিক সত্যগুলোকে অস্বীকার করতে চাইছে — মনগড়া কতগুলো ধারণা এবং ব্যক্তির বিশ্বাসের ওপর নির্ভর ক'রে চলতে চাইছে — মার্কসবাদ সেখানে বৈজ্ঞানিক সত্যগুলোর ওপর দাঁড়াতে চাইছে, বিজ্ঞানের বিশেষ সত্যগুলোকে সংযোজিত (কো-অর্ডিনেট) করে সাধারণ সত্যে পৌঁছাতে চাইছে।

একমাত্র বিজ্ঞানের সাহায্যেই সত্য জানা সম্ভব

অন্যান্য দর্শন কী করে? অন্যান্য দর্শন মনে করে যে, বিজ্ঞান বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে কতগুলো সত্য আবিষ্কার করতে সক্ষম — কিন্তু দুনিয়া সম্বন্ধে মূল সত্যোপলব্ধি বিজ্ঞানের দ্বারা সম্ভব নয়। তাদের ধারণায় বা কল্পনায় বস্তুবহির্ভূত যে সত্তা অবস্থান করে, বিজ্ঞান তার খবর দিতে পারে না। তাই তারা মনে করে — বিজ্ঞানের সাহায্যে সমস্ত সত্যকে জানা, জীবনের সমস্ত দিককে জানা সম্ভব নয়। তাহলে সেই সত্য জানা কীভাবে সম্ভব বলে এই দর্শনগুলো মনে করে? না, এইসব দর্শনের মতে ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির পথেই নাকি সেটা সম্ভব। এ কথার মানে দাঁড়ায় যে, সমস্ত মানব সমাজের উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতাপ্রসূত যে বিজ্ঞান, সেই বিজ্ঞানের সামগ্রিক প্রচেষ্টায় যা সম্ভব নয় — কোন একজন মনীষীর বিশ্বাস ও ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির পথেই সেটা সম্ভব! মার্কসবাদ এরকম উদ্ভট কথা মানে না, মানতে পারে না। মার্কসবাদ মনে করে যে, একজন মানুষের সত্যকে জানবার যা ক্ষমতা, সত্য জানার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ক্ষমতা তার চেয়ে অনেক বেশি। কাজেই সত্যকে জানবার ক্ষেত্রে কোন মানুষের বিশ্বাস বা ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির ওপর নির্ভর করার চেয়ে বিজ্ঞানের ওপর

নির্ভর করাই যুক্তিসঙ্গত। অন্য সমস্ত দর্শনের সাথে মার্কসবাদের এখানে একটা মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান।

দর্শনের কাজ কী

মার্কসবাদের সাথে অন্যান্য দর্শনের দ্বিতীয় পার্থক্য হচ্ছে — অন্য সমস্ত দর্শনই এতদিন পর্যন্ত দুনিয়াকে জেনে এসেছে, ব্যাখ্যা করে এসেছে — অন্তত চেষ্টা করেছে জানবার — কতটুকু পেরেছে কি পারেনি — সেটা ভিন্ন প্রশ্ন। কারণ, দর্শনের চেষ্টাটাই হচ্ছে, দুনিয়াকে জানা, বিভিন্ন সমস্যা ও সত্য সম্বন্ধে একটা সঠিক ধারণা গ্রহণ করা। মার্কসবাদ আসার আগে পর্যন্ত দর্শনের কাজ ছিল দুনিয়ার বিভিন্ন ঘটনাবলীকে শুধু ব্যাখ্যা করা। মার্কসবাদই একমাত্র দর্শন যা প্রথম বলল যে, নিছক জানার কোন মানে নেই। বলল — শুধু জেনে কী লাভ, যদি না, জানা জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারি? অর্থাৎ মার্কসবাদ বলছে, দুনিয়াকে জানাই শুধু দর্শনের কাজ নয়, দুনিয়াকে পরিবর্তন করাও দর্শনের কাজ। তাহলে দেখা যাচ্ছে, মার্কসবাদী দর্শনের সাথে অন্যান্য দর্শনগুলোর আর একটা পার্থক্য এইখানেই যে, অন্যান্য দর্শনের কাজ যেখানে দুনিয়াকে শুধু ব্যাখ্যা করা — সেখানে মার্কসবাদের কাজ শুধু ব্যাখ্যা করা নয় — জানা, ব্যাখ্যা করা, সঠিকভাবে উপলব্ধি করা এবং দুনিয়ার পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করা। এখন এই মার্কসবাদকে বুঝতে হলে দার্শনিক চিন্তার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস সম্বন্ধে, দর্শনের অগ্রগতি বা 'ডেভেলপমেন্ট'-এর ইতিহাস সম্বন্ধে, মোটামুটি একটা ধারণা আমাদের থাকা দরকার। একটা ক্লাসে এর সবটা আলোচনা করা সম্ভব না হলেও, মূল মূল বিষয়গুলো, যতটুকু সময় আমি পাব, সাধ্যমত রাখবার চেষ্টা করব।

চিন্তার উৎপত্তি ও মানব সভ্যতার বিকাশ

এ সম্পর্কে আলোচনার শুরুতেই একটা কথা আপনাদের বলে যেতে চাই। তা হচ্ছে, অন্যান্য জীবজন্তু-জানোয়ারের সাথে মানুষের একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। সে পার্থক্যটা কী? সে পার্থক্যটা হচ্ছে, মানুষ তার মস্তিষ্ককে কেন্দ্র করে চিন্তা করার অধিকারী, বিশ্লেষণ করার অধিকারী, বিচার করার অধিকারী। মানুষ এই বৈশিষ্ট্য নিয়েই দুনিয়ায় এসেছে। অন্যান্য জীবজন্তু-জানোয়ারের অনুভূতি আছে, স্নায়বিক উত্তেজনা আছে; কিন্তু চিন্তা করার, বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা তাদের নেই। মানুষের ক্ষেত্রে চিন্তা করার এই ক্ষমতা একমাত্র তার মস্তিষ্কের গঠনের ফলেই সম্ভব হয়েছে। আর এই ক্ষমতার জন্যই মানুষ অন্যান্য জীবজন্তু থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। অন্যান্য জীবজন্তু আজও সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, অর্থাৎ, তারা পুরোপুরি প্রাকৃতিক নিয়মের দাস। তারা প্রাকৃতিক নিয়মের দাসত্বের ঊর্ধ্বে কেউ উঠতে পারেনি — প্রকৃতিকে তারা বশ করতে পারেনি। ফলে তারা বনে-জঙ্গলে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে যতদিন বাঁচবার বাঁচছে — বাঁচবার জন্যে চেষ্টা করছে। চেষ্টা করে হয় খতম হয়ে যাচ্ছে, না হয় কোনমতে বাঁচছে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তার বাঁচবার চেষ্টার মধ্য দিয়ে আমরা একটা নতুন জিনিস দেখতে পেলাম। মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মের সম্পূর্ণ বশীভূত থাকতে চাইল না। প্রকৃতির নিয়মকে সে জানল, বুঝল — প্রাকৃতিক শক্তিকে নিজের আয়ত্তে এনে সভ্যতা, সংস্কৃতি, সমাজজীবন গড়ে তোলার কাজে ব্যবহার করতে শিখল। এরই ফলে মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে, সভ্য হয়ে, জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতি করে, কৃষ্টির সৃষ্টি করে আজ বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। মানবসমাজের এই অগ্রগতি কিন্তু একদিনেই হয়নি। এর একটা দীর্ঘ ইতিহাস আছে। মানুষ চিরকাল এ জায়গায় ছিল না। এমন একটা সময় ছিল যখন মানুষ সমাজবদ্ধও ছিল না। বনে-জঙ্গলে প্রাকৃতিক নিয়মের প্রায় সম্পূর্ণ অধীনেই সে চলাফেরা করত। চিন্তা করার ক্ষমতা ছাড়া অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের সাথে আর বিশেষ কোন পার্থক্য তার ছিল না। মানুষের মস্তিষ্ককে কেন্দ্র করে মানুষের চিন্তা করার যে ক্ষমতা আছে — যা অন্যান্য জীবজন্তুর নেই, তার ফলে দুনিয়ার সমস্ত জীবের মধ্যে একমাত্র মানুষই পারিপার্শ্বিককে বুঝতে শিখেছে, প্রাকৃতিক শক্তিকে জয় করতে শিখেছে এবং নানা সমস্যার সমাধান করার উপায় বের করতে শিখেছে। আদিম মানুষ এইভাবেই সেই গোড়ার যুগে যতটুকু চিন্তা করতে শিখেছিল, তাতে বুঝতে পেরেছিল যে, একা একা বাঁচার চেষ্টা করা মূর্খতা। এভাবে তারা বেঁচে থাকতে পারে না। বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বাঁচতে হ'লে, টিকে থাকতে হ'লে, গোষ্ঠীবদ্ধ হওয়া দরকার। বাঁচার তাগিদে প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে, প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে প্রথম যে উপলব্ধি সে লাভ করল — তাদের আদিম চিন্তাশক্তি থেকে

উদ্ভূত যে উপলব্ধি — সে উপলব্ধি হচ্ছে যে, গোষ্ঠীবদ্ধ প্রচেষ্টার মারফত আমাদের বাঁচতে হবে। 'উই কান্ট লিভ অ্যালোন' — একা একা আমরা বাঁচতে পারি না। আমাদের সম্মিলিতভাবে লড়াই করতে হবে এবং সম্মিলিতভাবে, গোষ্ঠীবদ্ধভাবেই বাঁচার চেষ্টা করতে হবে। এই হল মানবসভ্যতার গোড়ার চেতনা। এটাই হ'ল সমাজ গড়ে ওঠার বুনিয়াদী কথা। এই প্রাথমিক কথাটা আমাদের মনে রাখা দরকার। এই চেতনার ভিত্তিতেই মানুষের সমাজ গড়ে উঠেছে এবং আমরা সামাজিক জীব হয়েছি। 'সোস্যাল বিইং' — সেটা এই চেতনার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে যে, একা একা আমরা বাঁচতে পারি না। আমাদের বাঁচতে হবে সমষ্টিগতভাবে, সমষ্টিগতভাবেই লড়তে হবে বিরুদ্ধশক্তির বিরুদ্ধে। আর এই সম্মিলিতভাবে লড়াই করার মধ্য দিয়েই আমরা পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে আয়ত্তে আনতে পারি, বশীভূত করতে পারি, কাজে লাগাতে পারি। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আদিম মানুষ এই চিন্তা করতে শিখলো।

মানুষের আদিম চিন্তা ছিল বস্তুতান্ত্রিক

এখন 'ট্রাইবগুলো'র ইতিহাস থেকে, গুহার দেওয়ালের ছবিটবি দেখে, তাদের ইতিহাস গবেষণা (রিসার্চ) করে আজ পর্যন্ত আদিম মানুষের জীবন সম্পর্কে যতটুকু আমরা জানতে পেরেছি, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, এই আদিম মানুষের চিন্তা ছিল বস্তুতান্ত্রিক — ভাববাদী নয়। আদিম মানুষের চিন্তার মধ্যে ভাববাদের কোন স্পর্শ বা ছোঁয়াচ ছিল না। সুতরাং, বস্তুতান্ত্রিক চিন্তা নিয়েই মানবসমাজের যাত্রা শুরু। কিন্তু, এই বস্তুতান্ত্রিক চিন্তা পরবর্তীকালে একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে এসে বস্তুতান্ত্রিক থাকেনি — বস্তুবাদী চিন্তার পাশাপাশি ভাববাদী চিন্তা মানুষের সমাজে জন্ম নেয়। তারপর থেকেই ভাববাদ এবং বস্তুবাদ — ভাববাদী চিন্তা এবং বস্তুবাদী চিন্তা — এই দুই মতবাদ, দুই চিন্তাপদ্ধতি মানুষের সমাজে পাশাপাশি চলে এসেছে। এখন এই ভাববাদী চিন্তার জন্মেরও একটা ইতিহাস আছে। যেখানে আদিম মানুষের গোড়ার চিন্তা ছিল বস্তুতান্ত্রিক, সেখানে তার মধ্যে ভাববাদের বা ভাববাদী দর্শনের জন্ম হ'ল কী করে? এর কার্যকারণ সম্পর্ক কী? এ প্রশ্ন ওঠা অত্যন্ত স্বাভাবিক। ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, আদিম মানুষের অতিপ্রাকৃত শক্তি সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না। শক্তি সম্বন্ধে যদিও তার ধারণা ছিল খুবই অস্পষ্ট, কিন্তু একটা ধারণা তার ছিল, তা হচ্ছে, শক্তি মানেই বস্তুর শক্তি। তা ছিল তার কাছে দুর্জ্ঞেয় শক্তি, অনিষ্টকারী বা মঙ্গলকারী শক্তি, কিন্তু বস্তুরই শক্তি। হয় পাথরের শক্তি, নয়তো বাতাসের শক্তি, না হয় গাছের শক্তি, বাঘের শক্তি, জলের শক্তি বা আগুনের শক্তি। শক্তি সম্বন্ধে তার ধারণাটা ছিল এ রকম। কাজেই শক্তি সম্বন্ধে আদিম মানুষের ধারণা ছিল বস্তুতান্ত্রিক — অর্থাৎ, শক্তি মানেই বস্তুর শক্তি। যেমন একটা পাথর গড়িয়ে পড়ল — পড়ে কিছু মানুষকে চাপা দিল। মানুষ মনে করতো এটা একটা ভৌতিক শক্তি (ফিজিক্যাল ফোর্স)। বিজ্ঞানের ছাত্ররা জানেন যে, এই ভৌতিক শক্তিকে বিজ্ঞানে বস্তুর শক্তি বা ফিজিক্যাল ফোর্স হিসাবেই গণ্য করা হয়। আদিম মানুষের কাছে ভূত একটা অতিপ্রাকৃত, নির্বস্তু বা বস্তুনিরপেক্ষ কোন সত্তা ছিল না। ভূত ছিল ঐ বাস্তব পাথরটার শক্তি — যেটা গড়িয়ে পড়ে মানুষকে চাপা দেয়, আঘাত দেয়। আদিম মানুষ সেদিন এই পাথরকে বশে আনার জন্য, নানারকমে সন্তুষ্ট করার জন্য পুজোটুজো করতে শুরু করল। পাথরকে বা বস্তুকে বশীভূত করার জন্য তাদের আদিম পদ্ধতি যেটা ছিল — তাই হল মন্ত্রতন্ত্র। এই মন্ত্রতন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছিল বস্তুর শক্তিকে কাজে লাগাবার জন্য, তাকে নিজেদের আয়ত্তে (কনট্রোলে) আনার জন্য। এটাই হল গোড়ার ইতিহাস। তাই মন্ত্রতন্ত্রকে বলা হয় আদিম মানুষের বিজ্ঞান। মনে রাখতে হবে, এই বিজ্ঞান বর্তমান মানুষের বিজ্ঞান নয় — আদিম মানুষের বিজ্ঞান। বিজ্ঞান কেন বললাম? বিজ্ঞান আজ কী করছে? বিজ্ঞানের সাহায্যেই বস্তুর শক্তি, বস্তুর রহস্য, বস্তুজগতের বিভিন্ন নিয়ম, চলার ভঙ্গি — এইগুলো আমরা আজ জানছি। কিন্তু আদিম মানুষ সেদিন ঐ বস্তুকেই জানতে চেয়েছে, বশীভূত করতে চেয়েছে মন্ত্রতন্ত্রের দ্বারা। কেননা অন্য কোন উপায় বা পদ্ধতি মানুষের জানা ছিল না। তাই যেমনভাবে বুঝেছে, তেমনভাবেই মানুষ ভেবেছে এবং আবোল-তাবোল অনেক কাজ করেছে। তাই বহু মন্ত্র আছে — একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন — যার অনেক কথারই কোন মানে হয় না। কোন মাথামুণ্ডু নেই। আর এহেন সম্বল নিয়েই আদিম মানুষ সেদিন প্রাকৃতিক শক্তিকে বশীভূত করতে চেয়েছে। বস্তুকে বশীভূত করার জন্যই আদিম মানুষ সেদিন যে মন্ত্রতন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছিল, অর্থাৎ, যে মন্ত্রতন্ত্র সেদিন তার কাছে ছিল বস্তুকে জানা এবং সন্তুষ্ট বা বশীভূত করার উপায় মাত্র — কতটুকু পেরেছে বা

পারেনি সে কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র — ইতিহাসের পথ বেয়ে পরবর্তীকালে সেই মন্ত্রতন্ত্র নির্বস্তু বা বস্তুনিরপেক্ষ অদৃশ্য শক্তি বা দেবতাকে সন্তুষ্ট বা পূজো করার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছে। ভাববাদ, ঈশ্বরবাদ, ভগবানতত্ত্ব — এই সমস্ত যখন সমাজে এসে গেল — তখনই সেই মন্ত্রতন্ত্র ক্রমে ক্রমে ভগবানকে পূজো করার মন্ত্রে পরিণত হল।

আদিম অবস্থাতে গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ ভাঙেনি

এখন এই আদিম সমাজ ছিল গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ, বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়েই সমাজ চলছিল। এই গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের জীবিকার উপায় কী ছিল? তাদের জীবিকার উপায় ছিল ফলমূল আহরণ করা, শিকার করা। তখন তারা সম্মিলিতভাবেই শিকার করত। শিকার করে যা পাওয়া যেত — সেটা নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি করে হোক, গায়ের জোরে হোক, ভাগাভাগি করে খেত। সম্পদ সঞ্চ য় করা, জমানো বা বাড়ানো তখন সম্ভব ছিল না। কারণ জমাবার বা বাড়াবার মত কোন সম্পদ বা সম্পত্তির সৃষ্টিই তখন হয়নি। মানুষের সমাজে তখন এমন একটা যুগ, সে যুগে স্থায়ী সম্পত্তি বা সম্পদ — যাকে জমিয়ে রাখা যায় এবং জমিয়ে রেখে পরে ভোগ করা যায়, বাড়ানো যায়, ফাঁপানো যায়, বাড়াবার কাজে অপরের পরিশ্রমকে কাজে লাগানো যায় — এমন কোন অবস্থারই সেদিন উদ্ভব হয়নি। মানুষের জীবনযাত্রা তখন অনেক সরল ছিল। আমি আগেই বলেছি, একা একা বিরুদ্ধ প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বাঁচা যাবে না — এই বাস্তব প্রয়োজন এবং এইটুকু চেতনার ভিত্তিতেই মানুষ সেদিন গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছিল। তাই গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে তারা বাস করতো, শিকার করতো এবং এইভাবেই জীবনযাপন করতো। ব্যাপারটা এমন ছিল না যে, যা শিকার-টিকার করতো, কোন শুভবুদ্ধি র দ্বারা পরিচালিত হয়ে, ন্যায়নীতির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তা পরস্পরের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে তারা সবাই মিলে খেত। এসব ন্যায়নীতি বা বিচারবুদ্ধি, কোন কিছুরই সেদিন জন্ম হয়নি। মানুষ তখন বলতে গেলে প্রায় পশুর মত — আদিম অবস্থাতে তো বটেই, এমনকী গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের প্রথমদিকেও। কাজেই তার রূপ ছিল পাশবিক, বৈশিষ্ট্যগুলোও ছিল জন্তু-জানোয়ারের মতই। এই পাশবিক চরিত্রের জন্যই একে অপরের কাছ থেকে কেড়ে, জোর-জবরদস্তি ছিনিয়ে নিয়ে খেত। এসব সেদিন চলত। যা শিকার করে নিয়ে আসা হল — যার গায়ের জোর বেশি সে এক থাবা দিয়ে কেড়ে নিয়ে খেয়ে ফেলল। যে বুড়ো, অথর্ব, সে হয়তো ধুঁকছে — একটু ফাঁকে-ফুঁকে চিমটি দিয়ে একটু খাবার চেষ্টা করছে — কখনও খেতে পারছে, কখনও তাও পারছে না। এরকম একটা অবস্থাতেও কিন্তু গোষ্ঠী বা গোষ্ঠীগত যে চরিত্র সেটা সেদিন ভাঙেনি।

লোভ থেকে অসাম্য সৃষ্টি হয়নি,
অসাম্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমাজে লোভের জন্ম

একথাগুলো আমি বলছি এইটে দেখাবার জন্য যে, যাঁরা বলেন, সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হয়েছে, ধনী দরিদ্রের সৃষ্টি হয়েছে, বড়লোক গরিব বা অসাম্যের সৃষ্টি হয়েছে মানুষের মধ্যে লোভ থাকার জন্য — যাঁরা বলেন, লোভ একটা শাশ্বত প্রবৃত্তি, এটা চিরকাল ছিল এবং চিরকাল থাকবে — তাঁদের এই ধারণাটা কত ভুল। এঁরা অনেকেই মনে করেন যে, নিজে বড় হবার জন্য অপরকে দাবাতে পারলে মানুষ দাবাবেই, আর সেই কারণেই একদল লোক সবসময়ই বড় হবে, সমাজে অসাম্য এবং ধনী দরিদ্রের সৃষ্টি হবে। এঁরা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে কথাটা বলছেন না;বলছেন, নিজেদের মনগড়া ধারণা থেকে। নাহলে তাঁরা দেখতে পেতেন যে, মানুষের সমাজে অসাম্য ঐ নিচু বৃত্তিগুলোর জন্য সৃষ্টি হয়নি, বরং অসাম্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমাজই ঐ নিচু বৃত্তিগুলোর জন্ম দিয়েছে এবং তাকে জিইয়ে রাখতে সাহায্য করেছে। একথার দ্বারা আমি যে দিকটা দেখাতে চাইছি এবং যে কথাটা আমাদের খুব ভাল করে মনে রাখা দরকার, সেটা হল, প্রায় জানোয়ারের প্রবৃত্তি নিয়েও আদিম মানুষ সেদিন গোষ্ঠীবদ্ধ ছিল, সেগুলি ভেঙে যায়নি — মালিক-মজুরও হয়নি, শ্রেণীবিভেদও দেখা দেয়নি। যেমন রাস্তার দুটো কুকুরকে এক টুকরো খাবার নিয়ে লড়ালড়ি করতে দেখি — আদিমযুগের মানুষগুলোর প্রকৃতি অনেকটা সেরকম ছিল। শারীরিক তাকতের ওপর, জবরদস্তি করে, জোর করে, জানোয়ারের মত একজন আর একজনের থেকে কেড়ে নিয়ে খাবার খেয়েছে — তবুও গোষ্ঠী ভাঙেনি। শ্রেণীর জন্ম হয়নি। আজ যে আমরা মালিক, মজুর, কেরানি, ব্যবসাদার, জোতদার, মধ্যচাষী, ভূমিহীন চাষী

— এসব দেখছি, এইসবের জন্ম সেদিন হয়নি। তাহলে শ্রেণীর সৃষ্টি হ'ল কী করে?

চাষবাসের প্রবর্তন ও তার ফলাফল

শ্রেণীর সৃষ্টি হল তখন, যখন সমাজে সম্পত্তি এল, স্থায়ী সম্পত্তি দেখা দিল। উৎপাদন ব্যবস্থা যখন এমন একটা স্তরে পৌঁছালো যে, উৎপাদন ব্যবস্থায় স্থায়ী মালিকানার সম্ভাবনা দেখা দিল, সেই স্থায়ী মালিকদের পক্ষে উৎপাদনকে পুরোপুরি ভোগ করবার স্থায়ী সুযোগ দেখা দিল, বৃদ্ধি করার সুযোগ দেখা দিল এবং উৎপাদনে অপরের পরিশ্রমকে কাজে লাগিয়ে আরাম লোটার সুযোগ দেখা দিল — তখনই শ্রেণী এসে গেল। যতদিন পর্যন্ত উৎপাদন ব্যবস্থা এই জায়গায় না পৌঁছেছে, ততদিন পর্যন্ত সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হয়নি। মানুষের সমাজে এই অবস্থার সৃষ্টি হল কোন্ সময়ে? মোটামুটি বলতে গেলে বলা চলে — পশুপালন এবং বিশেষ করে চাষবাসের প্রবর্তনকে কেন্দ্র করে মানুষের সমাজে যখন স্থায়ী সম্পত্তির সৃষ্টি হল। গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ শিকার করে খেতে খেতে, ফলমূল আহরণ করে খেতে খেতে এবং এইভাবে চলতে চলতে হঠাৎ নজর করল — অর্থাৎ, তার নজরে পড়ে গেল যে, যেখানে আম খেয়ে একদিন সে আমের আঁটিটি ফেলে গিয়েছিল সেখানে একটা আমগাছ হয়েছে এবং তাতে একইরকম ফল ধরেছে। এটা মানুষের চিন্তায় ধাক্কা দিল। সে ভাবল, তাহলে এই আঁটি অর্থাৎ বীজ থেকেই গাছ হয়। তবে তো বীজ বপন করলেই সেখানে গাছ হবে, ফল হবে, ফলন ফলানো যাবে। এটা ভাবতে মানুষের বহু বছর কেটে গেছে। এই চেতনার ভিত্তিতেই একদিন মানুষের সমাজে জমি কর্ষণ করে জমিকে চাষের উপযোগী করার চেষ্টা হল।

তাহলে দেখা গেল, মানুষ আদিম অবস্থায় গোষ্ঠীবদ্ধভাবে আজ এখানে, কাল সেখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াতো। সমস্ত মানবসমাজটাই সেদিন বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। আজ যাকে জাতি বলছি, দেশ বলছি, ঐতিহ্য বলছি — এসব কিছুই একদিন ছিল না। আজ যাকে ভাষা বলছি — সেরকম ভাষারও সৃষ্টি একদিন হয়নি। আদিম মানুষের ভাষাও স্বাভাবিকভাবেই অনেকটা জন্তু-জানোয়ারের ভাষার মত ছিল। আমি যে চাষবাস প্রবর্তনের কথা বললাম, সেটা এরকমই একটা স্তরে, অর্থাৎ, গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজেই হঠাৎ চাষবাস বা 'এগ্রিকালচার'-এর আবিষ্কার হল। চাষবাসের উপায়গুলো জানা হয়ে গেল। তখন গোষ্ঠীবদ্ধ এই মানুষগুলো সকলে মিলে জঙ্গল কেটে, বাঘের সঙ্গে লড়াই করে, অনাবাদী জমিগুলোকে চাষের উপযোগী করে তুললো।

স্থায়ী সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত মালিকানার আবির্ভাব

সুতরাং, একথা বুঝতে কারও অসুবিধা হয় না যে, জমির মালিক হয়ে এই পৃথিবীতে কেউ আসেনি। মালিকরা যে বলে, বাপ-পিতামহর আমল থেকে, যুগ-যুগান্তর থেকে সম্পত্তির ওপর অধিকার তাদের পবিত্র অধিকার — সেকথাটা কতবড় মিথ্যা, তা বোঝা দরকার। আমাদের সকলেরই জানা দরকার যে, তাদের বাপ-দাদাদের ঐ জমির মালিক হওয়ার পেছনেও একটা ইতিহাস আছে। সে ইতিহাসটা হল, জোচ্চুরির ইতিহাস, দাগাবাজির ইতিহাস, ঠকাবার ইতিহাস, জুলুমবাজির ইতিহাস, ডাকাতির ইতিহাস। সেই ইতিহাসটি আমাদের নিজেদেরও জানতে হবে, অন্যান্য চাষীদেরও বোঝাতে হবে। বাঘের সঙ্গে, মোষের সঙ্গে, জন্তুর সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে গোষ্ঠীবদ্ধ সমস্ত মানুষ সম্মিলিতভাবে যে জমিকে চাষের উপযোগী করে তুলল, প্রকৃতির সম্পদকে আহরণের উপযুক্ত করল — একদল লোক সকলের পরিশ্রমলব্ধ সেই জমি গায়ের জোরে কেড়ে নিয়ে নিজেরা মালিক হয়ে বসল। তাহলে দেখা গেল, সমাজে যখন চাষবাসের উপকরণ দেখা দিল, উৎপাদনের একটা স্থায়ী উপায় হিসাবে, স্থায়ী উৎপাদন যন্ত্র (মিন্স্ অফ্ প্রোডাকশন) হিসাবে যখন জমি এসে গেল — তখন মানুষের জীবনযাত্রায় একটা বিরাট পরিবর্তন এসে গেল। এর আগে যেমন ছিল যে, শিকার পেল তো খেল, ফলমূল জুটল তো খেল, না হলে খেল না — গোটা ব্যাপারটাই ছিল অনিশ্চিত, 'আনসার্টেন' এবং তার জন্য তারা ঘুরে ঘুরে বেড়াতো, যাযাবর জীবন যাপন করতো — ক্রমে ক্রমে সেখানে একটা ছেদ ঘটে গেল। কেননা, জমি হচ্ছে উৎপাদনের এমন উপকরণ যা থেকে বছর বছর ফসল পাওয়া যায়, তাকে ভোগ করা যায়। তাই জীবনধারণের জন্য ঘুরে বেড়ানোর আর প্রয়োজন রইল না। আর কী পরিবর্তন হল? না, মানুষের মধ্যে এই ধারণা এল যে, মালিকও হওয়া যায়। কাজেই এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে যারা তাকতদার লোক ছিল, তারা দেখল যে, এই জমিগুলির যদি তারা মালিক হতে পারে, তাহলে অপরের পরিশ্রমকে কাজে লাগিয়ে তার ফল ভোগ

করা যায়, আবার সেখানে জমির যে ফসল পাওয়া যাবে, তারা তারও মালিক হবে, তখন সেই সম্পদ তারাই ভোগ করতে পারবে — জমির ওপর পুরো অধিকার তাদেরই থাকবে। ফলে তারা আমিরি করতে পারবে।

এখানে একটা কথা বোঝা দরকার, তা হচ্ছে, অপরকে বঞ্চি ত করে এই আমিরির মনোভাব তাদের মধ্যে এল কেন? এটা হল এই কারণে যে, তার যা প্রয়োজন, সে যেমন আরামে থাকতে চায়, সকলের সঙ্গে ভাগ করে সে যদি জমির ফসল নিত, তাহলে সে আরামের প্রয়োজন তার মিটত না। তখনকার মানুষগুলো যদি ন্যায়বান হত, গান্ধীবাদী বা বুদ্ধের শিষ্য হত — তাহলে অবশ্য এরকম হত না। কিন্তু সমাজে তখন ন্যায়নীতির জন্ম হয়নি — গান্ধী-বুদ্ধের জন্ম হয়নি। মানুষের অবস্থা ছিল — আধা জানোয়ারের মত, বৃত্তিগুলোও তাই। কাজেই ওভাবে সে ভাবতে পারত না। মানুষের সামনে সেদিন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ছিল, তার নিজের প্রয়োজন। যেকোন আদর্শের চেয়ে তার এই বাস্তব প্রয়োজন, এই বাস্তব অবস্থার প্রভাবই তার ওপর সবচেয়ে বেশি ছিল। সেই বাস্তব অবস্থাটি কী? অবস্থাটা হল — জমি থেকে যতটা উৎপাদন হতে পারত, উৎপাদন ব্যবস্থা বা মানুষের উৎপাদন ক্ষমতা যে জায়গায় ছিল, তাতে সকলে মিলে ভাগ করে নিলে আরাম ভোগ করার উপায় তো ছিলই না, এমনকী সব সময়ে মানুষের প্রয়োজন মেটানোও সম্ভব হত না। গাছের একটা বল্কল, আর দু'বেলা পেট ভরে খাওয়া, সকলে সমানভাবে ভাগ করে নিলে বড়জোর এইটুকু জুটতো। তাও সব গোষ্ঠীর নয় — হয়তো একটা দুটো গোষ্ঠীর জুটতো, বাকিদের এতটুকুও জুটতো না। যে সমস্ত গোষ্ঠীগুলো হয়তো চাষবাসের এই উপকরণগুলো আবিষ্কার করতে পারেনি, বা এত জমিও হয়ত পায়নি, তাদের আবার নতুন জায়গায় গিয়ে এইগুলোর জন্য চেষ্টা করতে হত।

প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদনের স্বল্পতা ও সমাজে তার প্রতিক্রিয়া

সে যাই হোক, এখানে একটি বিষয় আমাদের ভাল করে বোঝা দরকার। সেটা হল — মানুষের প্রয়োজন ক্রমাগতই বাড়ে, তা এক জায়গায় বসে থাকতে পারে না। এটাই স্বাভাবিক, সুতরাং, একদিকে মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, আবার একই সাথে তার প্রয়োজন বা আরও ভালভাবে বেঁচে থাকার চাহিদাও বেড়ে চলেছে। এই সত্যকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। অথচ সেদিন মানুষ যতটুকু উৎপাদন করতে পারত — সেটা এই ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের তুলনায় ছিল অপ্রতুল। তাই, উৎপাদন যতটুকু হত — উৎপাদন ব্যবস্থার অনুন্নত অবস্থার জন্য তার বণ্টন নিয়ে ঝগড়া চলত। তখনকার উৎপাদন মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে পারেনি বলেই উৎপাদিত সম্পদ, কে বেশি ভোগ করবে — এই নিয়ে লড়ালড়ি চলতো। কিন্তু যদি গোড়া থেকেই এমন হত যে, মানুষের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের সাথে তাল রেখে উৎপাদনও প্রচুর হত — তর্কের খাতিরে এমন একটা পরিস্থিতিকে যদি আমরা মেনে নিই — তাহলে এই মনোবৃত্তির, অর্থাৎ, অপরকে ঠকিয়ে আমি একা কীভাবে ভোগ করব — এই মনোবৃত্তির জন্ম হ'ত না। যেমন ধরুন, মাঠে গিয়ে যখন আমরা বসি, তখন মাঠের হাওয়া খাওয়ার ব্যাপারে অপরকে ঠকানো, অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতার (কমপিটিশনের) কোন মনোভাব আমাদের মধ্যে দেখা দেয় না। কিন্তু বৈদ্যুতিক পাখা নিয়ে, এয়ারকন্ডিশন ঘর নিয়ে, মোটরগাড়ি চড়া নিয়ে আমাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আছে। আমরা সকলেই ইচ্ছা থাকলেও সে সব ভোগ করতে পারি না। এই মোটরগাড়ি চড়া নিয়ে একের অপরের সঙ্গে যে লড়াই আমাদের মধ্যে আছে — সেটা এজন্য যে, মোটরগাড়ির সংখ্যা কম। এগুলো সকলে মিলে ভোগ করার উপায় নেই। তাছাড়া কে মোটরগাড়ি চড়তে পারবে, আর কে পারবে না, এটা প্রত্যেকেরই ক্রয়ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। তাই পরস্পরের মধ্যে এই লড়াই হল ক্রয়ক্ষমতা বাড়াবার লড়াই — তারই প্রতিযোগিতা। তাই ব্যবসা করে হোক, চাকরি করে হোক, চুরি-ডাকাতি করে হোক — এইভাবেই আমরা এই আরামগুলো ভোগ করতে চাই। তাই আমাদের মধ্যে এই কম্‌পিটিশন, এই রেষারেষি — কে বড় হবে, তা নিয়ে লড়ালড়ি। আমাদের মধ্যে একে অপরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার এই চেষ্টা। কেন? না, এই আরামের উপকরণ আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। কিন্তু মাঠের হাওয়া নিয়ে আমাদের মধ্যে লড়াই হয় না। যে যত ইচ্ছা ভোগ কর, কাউকে ঠকাবার দরকার নেই। গড়ের মাঠে বসে যত ইচ্ছে হাওয়া খাও — তার জন্য কি কাউকে ঠকাবার দরকার হয়, না, দমাবার দরকার হয়? এখন জীবনের সমস্ত প্রয়োজনগুলি, যা মানুষের প্রয়োজন, তা যদি এমন প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব হয় এবং সমস্ত মানুষের কাছে সেগুলো পৌঁছে দেওয়া যায় — তাহলে প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজনই

মেটানো যায়। অর্থাৎ, প্রচুর পরিমাণে উৎপাদনের সাথে সাথে বণ্টন ব্যবস্থাও এমন করা যায় যাতে সকলেই সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ভোগ করতে পারে, তাহলে আর এই সমস্যা থাকে না, মানুষের মধ্যে প্রতিযোগিতার কোন মনোভাবই আর দেখা দিতে পারে না। কিন্তু সেটা তো মুখের কথা নয়। আদিম সমাজে এ প্রশ্ন উঠতেই পারে না। আজও সেটা মুখের কথা নয়।

সে যাই হোক, যে যুগের কথা আমরা আলোচনা করতে করতে এখানে এসে গেছি, সেই আদিম যুগে মানুষের মূল সমস্যাটা দাঁড়িয়ে গেল কোথায়? মূল সমস্যা যেটা দেখা দিল, সেটা হচ্ছে, প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদনের স্বল্পতা। তাই বণ্টন নিয়ে মানুষে মানুষে ঝগড়া দেখা দিল। সুতরাং সমস্ত মানুষের চেষ্টায় যে অনাবাদী জমিগুলোকে চাষযোগ্য করা হল — যাদের গায়ের জোর বেশি, এই ঝগড়াতে লাঠি আর গায়ের জোরে তারাই সে জমির মালিক হয়ে পড়লো। গোষ্ঠীপতিরা, যোদ্ধারা, তাকতওয়ালা লোকেরা গায়ের জোরে, লাঠির জোরে, গোষ্ঠীর অপরাপর সমান হিস্যাদার লোকগুলোকে দাসে পরিণত করল, গোলামে পরিণত করল — করে নিজেরা মালিক হল। আর ঐ বিনিপয়সার গোলামগুলোকে গোলাম হিসাবে খাটিয়ে নিজেরা আরাম এবং আমিরি করতে শুরু করল। আবার গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের আদিম অবস্থায় গোষ্ঠীগুলো যে যাযাবর জীবন যাপন করতো, এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ফলমূল আহরণের জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াত — তাতে একই জায়গায় দুটো গোষ্ঠীর সাক্ষাৎ হলে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ হতো, লড়ালড়ি হত। এই লড়াইয়ে যারা পরাজিত হতো, সেইসব লোকগুলোকে বেশি করে খাটিয়ে নেওয়া হত — পদানত করে নেওয়া হতো। সুতরাং এইসব প্রক্রিয়ায় কালক্রমে দাসমালিক বা বড়লোকের সৃষ্টি হল — তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিরও জন্ম হল। অর্থাৎ, একদিকে বেশিরভাগ দাস, অপরদিকে মুষ্টিমেয় কিছু দাসপ্রভু — গোটা সমাজটা এইভাবে দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল, দুটো শ্রেণীর জন্ম হল।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তির ইতিহাস

তাহলে এই ব্যক্তিগত সম্পত্তির গোড়ার কথাটা কী? ব্যক্তিগত সম্পত্তি সৃষ্টির গোড়ার কথা হল, অন্যায় আর জবরদস্তি। অন্যায় করে, জবরদস্তি করেই সমাজের সাধারণ সম্পত্তি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। সমস্ত মানুষের প্রচেষ্টায় যে প্রাকৃতিক সম্পদ উদ্ধার করা হয়েছিল, মানুষের কাজে লাগানো হয়েছিল, যে সমস্ত জমি উদ্ধার করার ক্ষেত্রে গোষ্ঠীর প্রত্যেকটি লোক সম্মিলিতভাবে কাজ করেছে — গোষ্ঠীপতিরা তাদের লাঠির জোরে সেই জমিরই মালিক হয়েছে। তারপর থেকেই ঐ লাঠির জোরেই আইনকানুন বানিয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে 'পবিত্র' বলে ঘোষণা করেছে, 'পবিত্র' করে রেখেছে। তাই লাঠির জোরে শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তিই সৃষ্টি হয়েছে তাই নয় — তাকে রক্ষা করার জন্য যে শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন হল, মানুষ তাকে মেনে নিতে পারল না। কাজেই মানুষকে মানাবার জন্যই মালিকদের শাসন ব্যবস্থা, সৈন্য ব্যবস্থা, আইনকানুন সব কিছুই গড়ে তুলতে হল, যাতে নাকি মানুষকে দিয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর তাদের এই 'পবিত্র' অধিকার মানিয়ে নেওয়া যায়। কাজেই এই যে আমরা দেখছি রাষ্ট্র, শাসনযন্ত্র, শাসননীতি, আইনকানুন — এইভাবেই কালক্রমে এগুলোর সৃষ্টি হল। মালিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে, মালিকশ্রেণীর স্বার্থকে কার্যে রূপান্তরিত করার জন্য মালিকশ্রেণীর দ্বারাই এর সৃষ্টি হ'ল।

এইখানে আমরা কতগুলো জিনিস পেয়ে গেলাম — যেগুলো মনে রাখা দরকার। প্রথমত আমরা পেলাম, রাষ্ট্র কী? রাষ্ট্র হল এক শ্রেণীর হাতে অন্য শ্রেণীকে নিপীড়নের যন্ত্র। তাই রাষ্ট্রের গড়ে ওঠার ইতিহাস শ্রেণী গড়ে ওঠার ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত। আমরা আগের আলোচনায় দেখেছি যে, গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজে রাষ্ট্র ছিল না। রাষ্ট্রের জন্ম হল তখনই, যখন সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হল, মালিকশ্রেণীর জন্ম হল, মালিকশ্রেণীর মালিকানাকে রক্ষা করার জন্য শাসনযন্ত্রের প্রয়োজন দেখা দিল, আইনকানুন সৃষ্টি হল, পুলিশি ব্যবস্থা, সামরিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিল। এরকম একটা পরিস্থিতিতেই দুনিয়াতে প্রথম রাষ্ট্রের জন্ম হ'ল।

আবার কী অদ্ভুত দেখুন! এই মালিকি ব্যবস্থা আসার পরই ঈশ্বরবাদ তথা ভাববাদের জন্ম হল। সেজন্য ঈশ্বরের সঙ্গে মালিকদের ভয়ানক দোস্তি। মালিকরা কোথাও ঈশ্বরবিরোধী নয় — বরং ভয়ানক ঈশ্বরভক্ত। কারণ, এই মালিকি ব্যবস্থার সঙ্গে ভাববাদ, ঈশ্বরবাদ ও ভগবৎ তত্ত্বের অভ্যুত্থানের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গীভাবে

জড়িয়ে আছে।

বস্তু থেকেই ভাবের জন্ম

আপনারা আগেই শুনেছেন যে, মানুষের গোড়ার চিন্তা ছিল বস্তুতান্ত্রিক এবং তা বস্তুতান্ত্রিক হতে বাধ্য। বিষয়টা আর একটু ব্যাখ্যা করে বলি। আসলে চিন্তা কী? মানুষ চিন্তা করে কীভাবে? চিন্তা করার ব্যাপারটা ঘটছে কী করে? আমরা জানি, মানুষের যে পঞ্চে ন্দ্রিয়, অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক — এই পঞ্চে ন্দ্রিয়ের মারফৎ মানুষ প্রতি মুহূর্তে বাইরের জগতকে স্পর্শ করছে, তার সংস্পর্শে আসছে, সেটা যেভাবেই হোক না কেন। এই বাইরের জগৎ বা বিশ্বপ্রকৃতি, মানুষ থাক বা না থাক, অবস্থান করছে। আমরা আছি বলেই বস্তুজগৎ আছে — ব্যাপারটা এরকম নয়। এখান থেকে আমরা চলে গেলে — এই মাইকটা, গ্লাসটা থাকবে না, তা নয়। আমি মরে গেলেও ভাটপাড়া থাকবে, তার বৈশিষ্ট্য নিয়েই বেঁচে থাকবে। কাজেই আমাদের মনে করার ওপর, ভাবার ওপর, আমাদের অস্তিত্বের ওপর এই বস্তু জগতের অস্তিত্ব নির্ভর করে না বা এগুলো মায়াও নয়। এই কথাটা মনে রাখা দরকার। It is an objective reality which exists independent of us, independent of human consciousness — অর্থাৎ এই বাস্তব জগতের অস্তিত্ব — মানুষের অস্তিত্ব, তার চেতনা নিরপেক্ষভাবেই অবস্থান করে। আমরা মনে মনে ভাবছি, চিন্তা করছি — তাই বাইরের জগৎ আছে, বা আমরা যেমন ভাবছি, দুনিয়াটা তাই — এসব সত্য নয়। আমরা যাই ভাবিনা কেন, দুনিয়া যা তাই। আমরা আবোল তাবোল অনেক কিছু ভাবতে পারি, তাতে কিছু যায় আসে না। আমরা ভাতকে ডাল ভাবতে পারি — কিন্তু তার জন্য ভাত ডাল হয়ে যায় না। আমরা ইলেকট্রিক ফ্যানকে অন্য কিছু ভাবতে পারি, কিন্তু ওটা যা তাই। এই যে বৈদ্যুতিক শক্তি, অর্থাৎ, যাকে আমরা 'ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি' বলি — তার যা যা গুণ, সেইসব গুণ নিয়েই সে অবস্থান করে। আমার মনে করার ওপর সে অবস্থান করে না। তার ওপর তার ধর্মও নির্ভর করে না। সুতরাং, এই যে বস্তুজগতের অবস্থান — সেটা মানুষের মন নিরপেক্ষ, চেতনা নিরপেক্ষ। বস্তুজগতের অস্তিত্ব স্বাধীন — মানুষের বুদ্ধি ও চেতনা নিরপেক্ষ। যদি কেউ বলেন, বস্তুজগতের অস্তিত্ব ও রূপ মানুষের চেতনার ওপর নির্ভরশীল — তাহলে বলতে হয় যে, হয় তিনি জেনে শুনে ঠকাচ্ছেন, নয়তো তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ — কিছুই জানেন না।

এখন যেকথা বলতে বলতে এখানে চলে এলাম, সেটা হচ্ছে মানুষ চিন্তা করে কী করে? মানুষের মস্তিষ্কের গঠনের মধ্যে যে বস্তু, তার যে ক্ষমতা — সেই ক্ষমতার ফলেই মানুষ চিন্তা করতে পারে। বাইরের এই জগৎটা প্রতিনিয়ত পঞ্চে ন্দ্রিয়ের মারফৎ মানুষের মস্তিষ্কে ধাক্কা দিচ্ছে, ঘাত-প্রতিঘাত হচ্ছে, 'ইন্টারঅ্যাকশন' হচ্ছে। মানুষের মস্তিষ্কের যে বিশেষ ক্ষমতার কথা বললাম, তাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'পাওয়ার অফ ট্রানস্লেশন অফ হিউম্যান ব্রেইন', অর্থাৎ, মানুষের মস্তিষ্কের চিন্তা করার, বিশ্লেষণ করার, বোঝার, বিচার করার ক্ষমতা। সুতরাং পঞ্চে ন্দ্রিয়ের মারফৎ মানুষের মস্তিষ্কে যে ঘাত-প্রতিঘাত হচ্ছে এবং তার ফলে মানুষের মস্তিষ্কের এই বিশেষ ক্ষমতা, অর্থাৎ, 'ট্রানস্লেশনের' ক্ষমতাবলে মানুষ চিন্তা করছে, বস্তুজগৎ সম্পর্কে অবহিত হচ্ছে। অর্থাৎ, আমরা ভাবছি, বুঝছি, চিন্তা করছি। তাহলে বস্তুই চিন্তার উৎস। সুতরাং, ঘটনা এবং পারিপার্শ্বিক যেমনভাবে এসে আমাদের মস্তিষ্কে ধাক্কা দেয় — তেমনভাবেই আমরা চিন্তা করি, দেখি, বিশ্লেষণ করি। আমি যাকে দেখি, শুধু সেটাই বস্তু নয়, আমার মস্তিষ্কে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ধাক্কা দিচ্ছে, সেটিও বস্তু থেকে গড়ে উঠছে। এমনকী যে মস্তিষ্ক দিয়ে আমি চিন্তা করছি, সেই মস্তিষ্কও বস্তু দ্বারাই গঠিত। বিভিন্ন জৈবিক পদার্থের (অরগ্যানিক কম্পাউন্ডস্) দ্বারাই মানুষের মস্তিষ্ক গঠিত। ফলে, বস্তু চিন্তা করছে, আবার বস্তুই চিন্তার উপকরণ জোগাচ্ছে এবং বস্তু বস্তুর সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করে, লড়ালড়ি করে চেতনার সৃষ্টি করছে, ভাবের সৃষ্টি করছে। তাই আদিম মানুষের পক্ষে বস্তুবাদী না হয়ে উপায় ছিল না।

সমাজে 'ভগবৎ চিন্তা' জন্ম হওয়ার কারণ

এখন, সমাজ যখন শ্রেণীবিভক্ত হল, মালিকশ্রেণী জন্ম নিল — মালিকি ব্যবস্থা যখন পাকাপোক্ত হল, সমাজে কতকগুলি আইনকানুন, নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রবর্তন হল, অর্থাৎ, একদল লোক শাসন পরিচালনা করতে লাগল — বিজ্ঞান কিন্তু তখনও উন্নত স্তরে পৌঁছায়নি। বিজ্ঞানের রূপ তখনও আদিম। অর্থাৎ, অনেকটা

মন্ত্রতন্ত্রের স্তরে। কী করে আগুন জ্বলছে, বৃষ্টি হচ্ছে, কী করে টাইফুন হয়, ভূমিকম্প হয়, মানুষ কোথা থেকে এল, মানুষের জন্ম হচ্ছে কী করে, মৃত্যু কেন হচ্ছে — এটা কেন হচ্ছে, ওটা কেন হচ্ছে — এরকম কত সমস্যা সে চোখ মেলে দেখতে লাগল। — প্রতিদিন ভোরে সূর্য উঠছে, বিকালে অস্ত যাচ্ছে, আবার সূর্য উঠছে, আবার অস্ত যাচ্ছে, শীত-গ্রীষ্ম বেশ ঘুরে ঘুরে আসছে, জোয়ার হচ্ছে, ভাটা হচ্ছে; কিন্তু এসব হচ্ছে কী করে? মানুষের চিন্তায় এই 'কী করে' প্রশ্নটা বারবার ধাক্কা দিতে লাগল। কিন্তু উত্তর দেবে কে? কেননা, এইসব প্রশ্নের উত্তর দেবার মত উপযুক্ত কোন বিজ্ঞান সেদিন মানুষের হাতে ছিল না। 'কী করে হচ্ছে,' 'কী করে হল', এর জবাব খুঁজতে গিয়ে মানুষের মগজে একটা চিন্তা একটা সময়ে এসে ধাক্কা দিল এবং সে চিন্তা ধাক্কা দিল তখনই, যখন সে চিন্তা মগজে আসার মত উপযুক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হল — তার আগে নয়। সে চিন্তাটা কী? মানুষ একটা সময়ে এসে ভাবতে শুরু করলো, মানুষের সমাজ শৃঙ্খলার ভিত্তিতে চলছে কী করে? না, এই কারণেই চলছে যেহেতু এর একজন সমাজপতি আছে, রাষ্ট্রের অধিপতি আছে, আইন প্রণয়নকারী আছে। কাজেই সমাজকে যেমন কাউকে না কাউকে পরিচালনা করতে হয় — তবে সমাজ সুশৃঙ্খলায় চলে; যেমন একদল মালিক আছে — বাকিরা তাদের প্রভু বলে মেনে নিয়ে তাদের আইনকানুন মেনে চলছে, মালিকরা যেমন চালাচ্ছে বাকিরা তেমন চলছে; ঠিক তেমনই এই দুনিয়ারও নিশ্চয়ই কেউ মালিক আছেন, প্রভু আছেন — যিনি দুনিয়াকে সব ব্যাপারে সুশৃঙ্খলায় চালাচ্ছেন। কাজেই এই যে সাদৃশ্য, অর্থাৎ, কতগুলো অভিজ্ঞতার সঙ্গে অপর কিছু ঘটনাকে তুলনা করা, 'অ্যানালজি ড্র' করা — সাধারণ বুদ্ধিতে মানুষের মাথায় এই সাদৃশ্যের যুক্তি (লজিক অফ রিজেমব্লেন্স) যেভাবে ধাক্কা দেয়, তা থেকেই তার মনে ভগবৎ চিন্তার জন্ম হয়। সুতরাং, ঈশ্বর ধারণা সৃষ্টির পেছনে এটাই ছিল বাস্তব পরিস্থিতি। এই বাস্তব পরিস্থিতি হচ্ছে, মানুষ দেখল মালিক, রাজা বা দাসপ্রভু দাসদের সুশৃঙ্খলায় পরিচালনা করে, তবেই দাসদের মধ্যে শৃঙ্খলা থাকে, সমাজে শৃঙ্খলা থাকে। কাজেই বিশ্বেরও এরকম কেউ মালিক বা প্রভু আছেন, যিনি বিশ্বের সমস্ত কাজকে সুশৃঙ্খলভাবে এবং নিয়মমাফিক চালাচ্ছেন। সুতরাং, এই আলোচনা থেকে আমরা দেখলাম যে, সমাজে মালিকগোষ্ঠী সৃষ্টি হওয়ার পর, তাদের আইন-শৃঙ্খলাগুলো সমাজে প্রবর্তিত হওয়ার পর, প্রকৃত বিজ্ঞানের অনুপস্থিতিতে বা বিজ্ঞানের শৈশব অবস্থার জন্যই এই ঈশ্বরবাদের জন্ম সম্ভব হ'ল। আর দুনিয়ার যে একজন প্রভু বা মালিক আছেন, এরকম একটা চিন্তা সমাজে এসে যাওয়ার পরে সমাজের প্রভুরা সেই চিন্তাকে তাদের স্বার্থে কাজে লাগালো। সে যাই হোক, এরকম একটা সময় থেকেই সমাজে বস্তুবাদ, আর ঈশ্বরবাদ বা ভাববাদ পাশাপাশি চলতে লাগল।

আদিম মানুষ বস্তুকেই জানতে, বুঝতে ও জয় করতে চেয়েছে

কাজেই যাঁরা বলেন — মানুষ ভগবানের অংশ, আমাদের আত্মা পরমাত্মার অংশ, তাই পরমাত্মার খোঁজ করা আত্মার ধর্ম এবং এই কারণেই মানুষ জন্মাবার সাথে সাথেই ঈশ্বরচিন্তায় রত — তাঁরা মানুষের অগ্রগতির ইতিহাসের কোন খোঁজই রাখেন না, তাঁরা সব আষাঢ়ে গল্প বলেন। তাঁরা জানেনই না যে, সমাজে মানুষের জন্মের পর থেকে মানুষের মনের গঠন এবং স্ফুরণ হওয়ার এক সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত মানুষ ঈশ্বরচিন্তা করেনি — করেছে বস্তুচিন্তা। বস্তুকেই সে জানতে চেয়েছে। যাকে সে বুঝতে চেয়েছে, জয় করতে চেয়েছে, জয় করার সাধনা করেছে — তা হ'ল বস্তু। আর, ঈশ্বরচিন্তা প্রথম এসেছে মালিকি ব্যবস্থা আসার পর। আমি আগেই বলেছি, যে, মালিকি ব্যবস্থায় এসেই তারা এরকম একটা ধারণা পেল, মালিক যেমন সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করে, দুনিয়ারও তেমনই কেউ মালিক আছেন — যার ফলে সবকিছু নিয়ম মেনে চলছে। কাজেই তদানীন্তন সামাজিক অবস্থা, বিজ্ঞান ও মানুষের চিন্তার শৈশব অবস্থা — এইগুলোই হচ্ছে ঈশ্বরচিন্তা ও ভাববাদী দর্শনের জন্মের মূল কারণ। সুতরাং ঈশ্বরচিন্তা করছে কে? করছে মানুষের মস্তিষ্ক। মানুষের মস্তিষ্কের চিন্তার মধ্য দিয়েই ঈশ্বর ধারণার সৃষ্টি। কাজেই বস্তুকে বা বস্তুজগতকে ঈশ্বর সৃষ্টি করেননি বা সত্যজ্ঞান, সত্যদৃষ্টি এবং সত্যিকারের উন্নত চিন্তার ফল হিসাবে ভগবৎ ধারণা বা ভাববাদী ধারণা আসেনি।

বস্তুর দ্বারা গঠিত যে মানুষের মস্তিষ্ক, মানুষের সেই মস্তিষ্ক বস্তুর রহস্য খুঁজতে গিয়ে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছে। বিজ্ঞানের আদিম অবস্থায় যখন সমস্ত প্রশ্নের জবাব দেওয়া বিজ্ঞানের পক্ষে সম্ভব ছিল না, অথচ সমাজে এমন কতগুলো জিনিস সাধারণ বুদ্ধিতে মানুষ দেখেছে এবং তা থেকে তুলনা করতে পেরেছে এবং মনে হয়েছে

যে, বোধহয় দুনিয়ারও এইরকম একজন মালিক আছেন,— মানুষের এই চিন্তাই তখন ঈশ্বর ধারণার সৃষ্টি করেছে। এই কারণেই পরবর্তী সময়ে আমরা দেখতে পাই যে, রাজাকে মনে করা হত ভগবানের অংশ। তাই তদানীন্তন শাস্ত্র ও সমস্ত ধর্মে রাজার বিরুদ্ধে লড়াই করাকে মনে করা হত দেবতার বিরুদ্ধে, ভগবানের বিরুদ্ধে লড়াই করা, যদিও ইতিহাসে কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা গেছে। দাসপ্রভুদের অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে কখনও কখনও ধর্মকে লড়াইয়ের পক্ষে কাজে লাগানো হয়েছে, এই যুক্তিকে অবলম্বন করে যে, যেহেতু ভগবানের রাজত্বে বলা হয় সকলেই সমান — সুতরাং দাসপ্রভুরা দাসদের বিরুদ্ধে অন্যায় অত্যাচার করে কার্যত ধর্মের বিরুদ্ধেই কাজ করছে। ক্রিশ্চিয়ান, ইসলাম প্রভৃতি ধর্মের ক্ষেত্রে দাসপ্রভুদের বিরুদ্ধে দাসদের লড়াইয়ে ধর্মকে এইভাবে কাজে লাগাবার নজির পাওয়া যায়। এই বিশেষ ঘটনা ছাড়া সমস্ত ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, সমাজের মালিক সম্প্রদায় ধর্মকে তাদের শোষণ-শাসনের পক্ষেই কাজে লাগিয়েছে। ফলে, সেদিন সমাজে এই ধারণাই প্রাধান্য বিস্তার করেছে, রাজার বিরুদ্ধে লড়াই করা চলে না, কারণ, রাজা ভগবানের প্রতিনিধি। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও গণতন্ত্রের ভাবধারা এই ধারণাকে ভেঙেছে। সেসব বহু যুগ পরে, ফরাসি বিপ্লবের সময়ে।

দুনিয়াজোড়া সামন্ততন্ত্রের গর্ভে যখন পুঁজিবাদের জন্ম হল, পুঁজিবাদী বিকাশের প্রয়োজনে ভূমিদাস প্রথাকে ভাঙার প্রয়োজন দেখা দিল, সামন্ততন্ত্রকে ভাঙার প্রয়োজন দেখা দিল, বিশেষ করে মানুষগুলোকে ব্যক্তি স্বাধীনতার ভিত্তিতে দাঁড় করাবার প্রয়োজন এজন্য দেখা দিল যে, তা নাহলে উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থা চালু করা যাবে না — তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন করে চর্চা শুরু হ'ল এবং সত্যিকারের বিজ্ঞানের জন্ম হল। আর, পুঁজিবাদের বিকাশের সাথে সাথে বিজ্ঞানের অগ্রগতিও জোর কদমে চলল। সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এতদিন বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছে, সত্যানুসন্ধানের পথকে অবরুদ্ধ করেছে, সত্যকে চাপা দিতে চেয়েছে। মনগড়া কথা দিয়ে, আষাঢ়ে গল্প দিয়ে একটা দার্শনিক কাঠামোকে ধরে রাখার চেষ্টা হয়েছে। কাজেই রাজা, মহারাজা, সামন্তপ্রভুরা ভাববাদী দর্শনের পৃষ্ঠপোষকতা করত। কেননা, এইসব ধারণা রাজতন্ত্রকে বহাল তবিয়তে রাখতে সাহায্য করেছে। "এ দুনিয়াকে চালায় রাজা, আর এ বিশ্বকে চালান ভগবান। তাই রাজা ভগবানের প্রতিনিধি, তাঁর ক্ষুদে প্রতিভূ। খোদ ভগবান রাজার ওপর সমাজ চালাবার ভার দিয়েছেন" — এই ধারণাই সমাজে সেদিন বেশি প্রচলিত ছিল। কিন্তু কীভাবে একজন রাজা হল, মালিক হল, কোন মানুষ তার সন্ধান রাখতো না। পুরনো ইতিহাস ঘেঁটে এসবের সন্ধান কেউ করেনি। জন্মের পর থেকে সকলে দেখে এসেছে উনি রাজা, ওঁর বাবা রাজা ছিলেন, তাঁর বাবাও ছিলেন রাজা। কাজেই মানুষ মনে করত খোদ ব্রহ্মা বা আল্লা বোধকরি নিজে এঁদের হাতে রাজত্ব দিয়েছেন। ধারণাটা ছিল অনেকটা এইরকম। এই রাজা হওয়ার বা রাজত্বের ইতিহাসটা যে লাঠিবাজির ইতিহাস, দীর্ঘদিন বাদে সে সব মানুষ ভুলে গেছে। কেননা, মানবসমাজের ক্রমবিকাশের যে স্তরে এইসব কাণ্ডকারখানা ঘটেছে তখন পুঁথির জন্ম হয়েছিল কি না — আজও তা গবেষণার (রিসার্চ) বিষয়। তাই লিখে রাখারও ব্যাপার ছিল না, ঘটনাও কেউ জানতো না। এই ছিল পরিস্থিতি। সুতরাং পরবর্তীকালে সমাজে যখন ভগবানের চিন্তার উদ্ভব হয়, তখন ধরেই নেওয়া হত যে, উনি ভগবানের প্রতিনিধি। এসব কারণেই বলছিলাম যে, পুরো সামন্ততান্ত্রিক যুগটাই ছিল ভাববাদী দর্শনের বিকাশের যুগ। এই সামন্তপ্রথা ও দাসপ্রথার যুগে ভাববাদী দর্শনের প্রচণ্ড দাপট। এর পাশাপাশি বস্তুতান্ত্রিক চিন্তাও চলেছে; কিন্তু অনেকটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে — বস্তুতান্ত্রিক দর্শন নিজেই যেন প্রলেটারিয়েট বা সর্বহারা, এমন করে চলেছে। ইতিহাস থেকে পাওয়া যায় যে, তখন সমাজপতিরা বস্তুবাদীদের ঠেঙিয়েছে, জাতিচ্যুত করেছে। অথচ, এই বস্তুবাদীদের মধ্যে অনেক 'জিনিয়াস' ছিলেন, যাঁরা ভাববাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন এবং তার জন্য তাঁদের অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। তাঁদের অন্ন জোটেনি, সমাজে তাঁরা স্থান পাননি; কারণ, রাজতন্ত্র তাঁদের সমর্থন করেনি। তবু তাঁরা পিছুপা হননি।

পুঁজির বিকাশ নতুন সম্ভাবনা নিয়ে এল

কিন্তু যখন সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার গর্ভে পুঁজিবাদ জন্ম নিল, তখন পুঁজির বিকাশ কতগুলো নতুন সম্ভাবনা নিয়ে দেখা দিল। সেই সম্ভাবনাগুলো কী কী? প্রথমত, বড় বড় কল-কারখানা করতে হলে মজুর চাই। কিন্তু সামন্ততন্ত্রে দেশের বেশিরভাগ মানুষ ভূমিদাস, তারা জমিতে বাঁধা। জমির মালিক তাদের দাস বা অর্ধদাসে

পরিণত করেছে। কাজেই এইসব সামন্তপ্রভু বা রথী-মহারথীদের হাত থেকে যদি ভূমিদাসদের মুক্ত করা না যায়, জমি থেকে মুক্ত করা না যায়, ব্যক্তিগতভাবে তাদের স্বাধীন করা না যায় — তাহলে বড় বড় কলকারখানা (লার্জ স্কেল ইন্ডাস্ট্রি) গড়ে উঠবে কীভাবে? মজুর পাওয়া যাবে কোথা থেকে? দ্বিতীয়ত, বড় বড় কল-কারখানার জন্য বিজ্ঞানের উন্নতি চাই, টেক্‌নোলজির উন্নতি চাই — এসব নাহলে খনিবিজ্ঞান (মাইনিং), নৌবিজ্ঞান (নেভিগেশন), যোগাযোগ ব্যবস্থা (ট্রান্সপোর্ট) এবং এককথায় বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠতে পারে না। অথচ, শিল্পের অগ্রগতির একটা যথার্থ চাহিদা (আর্জ), সত্যিকারের প্রয়োজন সমাজে দেখা দিল এবং পুঁজিপতিশ্রেণী সেটা অনুভব করতে শুরু করল। তখন পুঁজিবাদের চরিত্র ছিল বণিকী পুঁজিবাদের (মার্কেনটাইল ক্যাপিটালিজম) চরিত্র। আর এই বণিকী পুঁজিবাদের বিকাশের জন্য, বড় বড় কলকারখানা ও শিল্পের জন্য একটা চাহিদা সমাজে একই সাথে গড়ে উঠতে থাকল। পুঁজিপতিরা একে কাজে লাগাতে চাইল, এর পেছনে সম্পূর্ণ মদত দিতে থাকল। পুঁজিপতিরা তখন ছিল সমাজের প্রগতিশীল অংশ, যারা সামন্ততন্ত্রের পুরনো ধারণা, ন্যায়-নীতি, আদর্শ, দর্শন — এসব কিছুর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করল। শিল্প, সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান সমস্ত দিক থেকে একটা জেহাদ শুরু হয়ে গেল। আওয়াজ উঠল — পুরনোকে ভাঙো, নতুনকে আহ্বান কর, সত্যকে খুঁজে বের কর। এইভাবেই শুরু হল বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। আর এই বিজ্ঞানকে রুখবার জন্য রাজা-মহারাজারা উঠে পড়ে লাগল। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, বুর্জোয়ারা তখন বিজ্ঞানের পক্ষে। তাই সে যুগের বড় বৈজ্ঞানিক নিউটনকে বুর্জোয়ারাই 'মহর্ষি' বলেছে। তিনি কিন্তু ভগবানের নাম করেননি — তিনি একজন বৈজ্ঞানিক — সারা জীবন বিজ্ঞানের সাধনা করেছেন, বৈজ্ঞানিক নিয়মকানুন অনুসন্ধান করেছেন। কিন্তু বুর্জোয়ারা তাঁকেই বলেছে ঋষি। কেননা, তিনি একটা মস্ত বড় কাজ করে দিয়ে গেলেন। আমরা জানি যে, নিউটনের বিজ্ঞান সামন্ততন্ত্রের ভাবনাধারণার বিরুদ্ধে হেনেছে প্রচণ্ড আঘাত। নিউটনের বিজ্ঞানসাধনা থেকে যে বক্তব্য বেবিয়ে এল, তা হল, এইসব রাজামহারাজারা ভগবানের প্রতিভূ-ট্রতিভূ কিছু নয়। এসব মিথ্যা। ভগবান নিজেই আছেন কিনা সেটাই তো একটা মস্ত বড় সন্দেহের ব্যাপার। তাঁর অস্তিত্বই তো বস্তুজগতে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি যে কোথায় আছেন — কেউ তা জানে না। নিউটনের বিজ্ঞান বলল, মানুষের মগজ ও কল্পনা ছাড়া তো আর কোথাও ভগবানের অস্তিত্ব নেই। আর যিনি নিজেই নেই, তাঁর আবার প্রতিভূ কী? এর ফলে পুরনো ভাবনাধারণার ভিতকে তিনি নাড়া দিয়ে দিলেন। তাই রাজার বিরুদ্ধে লড়াই করতে মানুষের আর আটকাল না কোথাও। পাপ-পুণ্যের ভয়টাই তো মানুষকে বেশি করে আটকায়। আগে তো ধারণা ছিল, রাজার বিরুদ্ধে কথা বললেই নরকবাস। শাস্ত্রকাররা, চার্চের পণ্ডিতরা, টোলের পুরুতরা, মসজিদের মোল্লারা বোঝাতো, রাজার বিরুদ্ধে লড়লেই নরকবাস — কেননা রাজা স্বয়ং ভগবানের অংশ। বিজ্ঞানের সাধনায় এসব ধারণা ভেঙে গেল। তাই সমাজবিকাশের ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, পুঁজিবাদের বিকাশের যুগে বস্তুবাদী চিন্তার প্রবাহে আবার নতুন করে ঢেউ লাগতে শুরু করলো। বস্তুবাদী চিন্তার খোলাখুলি বিকাশের দ্বার নতুন করে উন্মুক্ত হল। চারদিকে তখন বিজ্ঞানের জয়জয়কার। আওয়াজ উঠল — জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা কর, সত্যকে অনুসন্ধান কর, বিচার কর, যুক্তি দিয়ে বুঝে নাও, নিজেকে পাল্টাও, পুরনো ধারণা পাল্টাও। যুক্তি দিয়ে যা কিছু মনে হবে অন্যায়, তাকে ছুঁড়ে ফেল। এসব কথা হল রেনেসাঁসের কথা, নবজাগরণের কথা, ফরাসি বিপ্লবের কথা। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান সর্বত্রই এই জেহাদ শুরু হয়ে গেল। এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার। বুর্জোয়ারা প্রথম দিকে বস্তুতান্ত্রিক হলেও, মার্কসবাদীরা যেমন বস্তুতান্ত্রিক তারা তেমন বস্তুতান্ত্রিক ছিল না — তাদের বস্তুতান্ত্রিক ধারণার মধ্যে ভাববাদের খাদ মেশানো ছিল। অর্থাৎ ডায়ালেক্‌টিক্যাল মেটিরিয়ালিজম বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মধ্যে বস্তুবাদ সম্পর্কিত যে ধারণা, আর বুর্জোয়ারা সেদিন যে বস্তুবাদী ধারণা নিয়ে চলেছে — এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য অনেক। ভাববাদ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত বস্তুতান্ত্রিক ধারণা তাদের ছিল না। কিন্তু একথা কোনমতেই অস্বীকার করা চলে না যে, তাদের চিন্তা বা দৃষ্টিভঙ্গি মূলগতভাবে বস্তুতান্ত্রিক ছিল। শুধু তাই নয়, পুঁজিবাদী অভ্যুত্থানের গোড়া থেকে একটা যুগ পর্যন্ত যে সমাজে বস্তুবাদী চিন্তা বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে, প্রচলিত ভাববাদী চিন্তাভাবনার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে, একথা আপনারা শুনেছেন। তাদের ঝোঁকটা ছিল বিজ্ঞানের দিকে। বৈজ্ঞানিক চিন্তা, যুক্তিবাদ, ন্যায়নীতির ভিত্তিতে সমস্ত কিছু বিচার করাকেই পুঁজিপতিরা তখন পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। কারণ, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা গড়ার জন্য তদানীন্তন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, অর্থাৎ, রাজামহারাজাদের বিরুদ্ধে, দাস

প্রথার বিরুদ্ধে তাদের লড়তে হয়েছে। দাসদের মুক্ত করতে হয়েছে। কাজেই ব্যক্তিস্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্লোগান তাদের তুলতে হয়েছে। এভাবে লড়াই করেই — আজ যে পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা আমরা দেখি তার বুনিয়াদ খাড়া করতে হয়েছে — শিল্পের অগ্রগতি, উৎপাদনের বিকাশ, পুঁজিবাদের অগ্রগতি তারা ঘটিয়েছে। আর, এর জন্য তাদের আর একটা কাজ করতে হয়েছে — প্রতিটি মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে, অন্তত আইনের চোখে হলেও, স্বাধীন করতে হয়েছে; যদিও একথা ঠিক যে, এ ব্যবস্থায় মানুষ পুরোপুরি স্বাধীন হয়নি। 'সার্ফডম' থেকে মুক্ত হয়েও 'সার্ফ'রা স্বাধীন হতে পারল না। তারা 'ওয়েজ স্লেভ' বা মজুরি-দাসে পরিণত হয়েছে। ভূমিদাসরা জমি থেকে, তার দাসত্ব ও বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে মজুরে পরিণত হ'ল, কল-কারখানার মজুরে পরিণত হ'ল। জমি থেকে মুক্ত হয়েও শেষপর্যন্ত তারা মজুরি-দাসে পরিণত হল কেন? হ'ল এই জন্য যে, সে যাবে কোথায়? খাবে কী? সুতরাং যদিও বা জমির মালিকের বন্ধন থেকে সে মুক্ত হ'ল, কিন্তু তারপরেই তাকে কলকারখানার মালিকের কাছেই ধরনা দিতে হ'ল। কাজেই যাদের বুর্জোয়ারা মুক্ত করে দিল, তাদেরই আবার প্রায় অর্ধদাসে পরিণত করল অর্থাৎ, যেমন খুশি মজুরিতে কলে-কারখানায় তারা কাজ করতে বাধ্য হ'ল। কেননা, পুঁজিবাদের নিয়মই হচ্ছে বেকার তৈরি করা। ফলে সেই সুযোগে কম মজুরিতে মজুরদের কাজে লাগানো শুরু হ'ল। তাই, দেখা গেল, বুর্জোয়ারা সমাজকে আর বেশি দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারল না। একটা সময়ে এসে পুঁজিপতিরাই স্তিমিত হয়ে পড়ল, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিতে পরিণত হ'ল। অর্থাৎ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, পরীক্ষিত সত্যের ওপর, যুক্তির ওপর যে বুর্জোয়ারা গোড়ার দিকে জোর দিয়েছে, সেই বুর্জোয়া ব্যবস্থা তখন প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া ব্যবস্থায় পরিণত হ'ল। বুর্জোয়াশ্রেণী যখন বিপ্লবীশ্রেণীর পরিবর্তে বর্তমান যুগের কায়েমী স্বার্থবাদী শ্রেণীতে পরিণত হ'ল, তখন সেই বুর্জোয়ারাই বিজ্ঞান থেকে মুখ ফিরিয়ে ভাববাদী দর্শন ও ভাববাদী চিন্তার পৃষ্ঠপোষকতা করেছে, বিজ্ঞানের রাশ টেনে ধরেছে। তখন এরকম একটা পরিস্থিতি দেখা দিল, যখন নিজেদের শোষণ ও শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে পুঁজিবাদ আর সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছে না; সমাজের বিকাশ ঘটাতে পারছে না, শিল্পের বিকাশ যতটুকু ঘটাতে পারছে, তার চেয়ে সংকট বাড়াচ্ছে বেশি, সংকট ডেকে নিয়ে আসছে অনেক বেশি।

মুমূর্ষু পুঁজিবাদ বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করে

তখন পুঁজিবাদ আর মানুষের মঙ্গল করতে পারে না, মানুষকে মুক্তির পথ দেখাতে পারে না। তখন শোষণের অভিশাপ ছাড়া মানুষকে দেবার মত আর তার কিছু নেই — তাই মানুষের জীবনে পুঁজিবাদ একটা বোঝার মত চেপে বসেছে। কী অদ্ভুত দেখুন! পুঁজিবাদের বিকাশের যুগে যে পুঁজিপতিরা সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে, সামন্ততান্ত্রিক কূপমণ্ডুকতা ও ধর্মীয় অন্ধতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, ভাববাদী দর্শনের বিরুদ্ধে লড়াই করে বস্তুবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ঘোষণা করেছে — সেই পুঁজিপতিশ্রেণীই পরবর্তীকালে কায়েমী স্বার্থবাদীদের মত, সামন্তপ্রভুদের মত আবার বস্তুতান্ত্রিক চিন্তা থেকে মুখ ফিরিয়ে ভাববাদের দিকে ঝুঁকেছে। এখন তাদের মুখেই 'রাম নাম'। তারাই আজ ভাববাদের পূজারি হয়েছে। "বিজ্ঞানের সুফলও আছে, কুফলও আছে," এই সব আলোচনা শুরু করে, নানারকম উল্টোপাল্টা আলোচনা করে বিজ্ঞান সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করে চলেছে। কিন্তু বিজ্ঞানকে তারা ফেলে দিতেও পারে না; কারণ, পুঁজিবাদী শিল্পোৎপাদনটা যে স্তরে এসে পৌঁছেছে, তাতে তাদের পক্ষে বিজ্ঞানকে পুরোপুরি ফেলে দেওয়াও সম্ভব নয়। কাজেই পুঁজিপতিদের যতটুকু প্রয়োজন সেই প্রয়োজন অনুযায়ী তারা বিজ্ঞানকে চালু রেখেছে বা কিছু কিছু অগ্রগতি ঘটিয়েছে; কিন্তু এর যে গতিবেগ ছিল তাকে স্তিমিত করা হয়েছে। বিজ্ঞানের জয়যাত্রার পেছনে গোড়ার দিকে পুঁজিপতিরা যে শক্তিতে উৎসাহ দিয়েছে, মদত জুগিয়েছে — আজ আর তা এরা জোগায় না। বরঞ্চ পারলে বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে এরা সীমিত করে। কারণ, বিজ্ঞানের অগ্রগতি এখন ওদের বিপর্যয় ডেকে আনছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি আজ শ্রেণীগতভাবেই তাদের অস্তিত্বের সংকট ডেকে আনছে।

পুঁজিপতিদের সর্বোচ্চ মুনাফার উদ্দেশ্যে পরিচালিত উৎপাদনব্যবস্থাই সংকটের মূল কারণ

কেন এমন ঘটলো, এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। যে পুঁজিবাদ একদিন সমাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছে,

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিপ্লব করেছে, বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে চলতে চেয়েছে, সত্যের সাধনা করেছে, পুরনো ধর্মীয় মূল্যবোধের বিরুদ্ধে মানবতাবাদী চিন্তাচেতনার ভিত্তিতে নতুন মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছে, সমাজ প্রগতির সহায়তা করেছে — সেই পুঁজিবাদ পরবর্তীকালে এসে কেন সমস্ত ক্ষেত্রে উল্টো সুর গাইছে? এটা এজন্যই ঘটেছে যে, এত কিছু সত্ত্বেও বুর্জোয়ারা শ্রমকে শোষণের হাত থেকে মুক্ত করতে পারেনি — মালিকি শোষণের হাত থেকে মুক্ত করতে পারেনি। মালিকি ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজে শুধু মুনাফা নয়, মালিকের সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনই হচ্ছে উৎপাদনের মূল লক্ষ্য। আর দেশের মানুষকে, কলকারখানায় নিযুক্ত শ্রমিককে শোষণ না করে মালিকের এই মুনাফা অর্জিত হতে পারে না। আর এই পথ বেয়েই সাধারণ মানুষ ক্রমাগত বঞ্চিত হতে হতে নিঃস্ব হয়েছে। প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে না পেরে বেশিরভাগ মালিক ছোট মালিকই থেকে গেছে বা ছোট মালিকে পরিণত হয়েছে, অপরদিকে গুটিকয়েক মালিকের হাতে সঞ্চিত হয়েছে সমাজের বেশিরভাগ ধনসম্পদ। পুঁজিবাদের বিকাশের পথে সমাজে যখন এরকম একটা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে, তখনই পুঁজিবাদ একচেটে পুঁজিবাদে রূপান্তরিত হয়েছে, অর্থাৎ পুঁজিবাদের সংকট গভীরতর হয়েছে। এর ফল কী দাঁড়িয়েছে? বিষয়টা ভাল করে বোঝা দরকার। আপনারা জানেন, সাধারণ মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন যাই থাকুক না কেন, পুঁজিবাদী শোষণের চাপে কেনবার ক্ষমতা, যাকে আমরা 'পারচেজিং ক্যাপাসিটি' বলি, প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। অথচ, বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে, 'টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট' খুব বেশি হবার ফলে সমাজে উৎপাদন বা উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি ঘটেছে প্রচুর। ফলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বাড়তি উৎপাদন (ওভার প্রোডাকশন)-এর সমস্যা দেখা দেয়। এই বাড়তি উৎপাদন কথাটার মানে কী? বাজারে চাহিদার চেয়ে উৎপাদন বেশি। এই চাহিদা মানে কি যথার্থ প্রয়োজন? না। মানুষের যা কেনবার ক্ষমতা, সমস্ত মানুষের কেনবার যা ক্ষমতা, সেটাই হল বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজের বা সেই বাজারের চাহিদা। এই চাহিদার চেয়ে যখন উৎপাদন বেশি হয়ে পড়ে, তাকেই বলা হয় বাড়তি উৎপাদন। তখনই দেখা দেয় সংকট। তখনই নেমে আসে ছাঁটাই-এর খড়্গ। ফলে, বেকারের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং পুঁজিপতিদের সামনে নিত্যনতুন সমস্যা দেখা দেয়। একটা নতুন মেশিন চালু করলে বেশি করে লোক ছাঁটাই হয়। বেকার মজুররা হল্লা করতে শুরু করে। এই ছাঁটাই হয় কেন? ছাঁটাই ঐ মেশিনটার জন্য, বা বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য হয় না। হয়, ঐ মুনাফার ভিত্তিতে যে সমাজব্যবস্থা — তার জন্য। পুঁজিপতিরা মেশিনটাকে মুনাফার স্বার্থে ব্যবহার করে বলেই, গোটা উৎপাদনটা পুঁজিপতিদের মুনাফার স্বার্থে চলে বলেই মজুর ছাঁটাই হয়। অথচ, এইসব ঘটনাকে সামনে রেখে পুঁজিপতিরা মানুষের মধ্যে একটা বিজ্ঞান-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করে। আর অসচেতনতার জন্য, বিষয়টাকে ঠিক ঠিক ভাবে না বোঝার জন্য, জনসাধারণও অনেক সময় ভুল বুঝে বিজ্ঞানকেই তাদের শত্রু বলে মনে করে।

বিজ্ঞান নয়, পুঁজিবাদই মানুষের শত্রু

যেমন ধরুন, কোন সময় একটা ক্রেন এসে গেলে মজুররা অনেক সময় মনে করে ঐ ক্রেনটা তার দুশমন, ওটাকে সে ভেঙে ফেলতে চায়। কেন? না, ক্রেনটা আসার আগে যেখানে এক হাজার মজুর মাল বইত, ওঠাতো-নামাতো — ক্রেনটা আসার পর এখন পাঁচশ' মজুরেই সেই কাজটা হতে পারে। তাই ক্রেন আসার ফলে পাঁচশ' লোক ছাঁটাই হয়ে যায়। মালিকরা তো আর মজুরদের বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবে না। ক্রেন আসাতে মালিকের খরচা অল্প হল, 'লেবার কস্ট', অর্থাৎ মজুরের মজুরি বাবদ যে খরচা সেটা কমে গেল, মালিকের লাভ হ'ল বেশি — কিন্তু মজুর ছাঁটাই হয়ে গেল। আর এসব দেখে মজুর মনে করে মেশিনটাই তার চাকরি খেলো। মজুরের এই ধারণাটা ভুল। কারণ, মেশিন তার চাকরি খেল না। মেশিনটা আসার ফলে তার জীবনে সুখ আসার কথা। আগে কালিঝুলি মেখে, প্রচণ্ড পরিশ্রম করে, মাথায় মোট বয়ে তাকে জীবিকা উপার্জন করতে হত, কিন্তু এখন মেশিন আসার ফলে সে চেয়ারে বসে বোতাম টিপে কাজ করতে পারে। এই সুবিধা বা সুখ এই মেশিনটা এনে দিল। এতে কিন্তু তার চাকরি যাবার কথা নয়। কিন্তু চাকরি গেল এজন্য যে, ক্রেন ব্যবহার হচ্ছে মালিকের মুনাফার স্বার্থে, মালিকের স্বার্থে। সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য মানুষের কর্মসংস্থান করা নয়, বা মেশিনের উন্নতি ঘটিয়ে মানুষের কাজে আরাম এনে দেওয়া নয় — এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পুঁজিপতিদের উৎপাদনের খরচ (কস্ট অফ প্রোডাকশন) কমানো এবং বেশি মুনাফা অর্জন। এই

লক্ষ্য নিয়ে সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের উৎপাদন পরিচালিত হয় বলেই মজুর ছাঁটাই হয়। তাই মজুরকে বুঝতে হবে যে, মালিকের মুনাফার লক্ষ্যের পরিবর্তে যদি মানুষের প্রয়োজনের জন্যই উৎপাদন পরিচালিত হত, তাহলে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হত না। তাই মেশিনকে পুঁজিপতিদের শোষণ, মুনাফা ও মালিকানার হাত থেকে মুক্ত করতে হবে। বিজ্ঞানকে, 'টেকনোলজি'কে এর হাত থেকে মুক্ত করতে হবে। একাজ যদি মজুররা করতে পারে, তবে মেশিন তাদের জীবনে সুখ এনে দেবে। মেশিন ছাড়া কাজ করলে তাদের যে পরিশ্রম হয়, যে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয় — মেশিনের সাহায্যে তারা তার চাইতে অনেক কম পরিশ্রমে, কম সময়ে বেশি কাজ করতে পারবে। কাজ করে তাদের আরাম হবে, আনন্দ হবে, সুখ হবে। সুতরাং মেশিন তাদের শত্রু নয় — শত্রু হচ্ছে পুঁজিবাদ। সমাজে বাড়তি উৎপাদনের সমস্যা, ছাঁটাই-এর সমস্যা, বেকার সমস্যা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি র সমস্যা — এই সব সমস্যার মূলেই রয়েছে সংকট জর্জরিত পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদে মালিকের সর্বোচ্চ মুনাফাটাই মূল লক্ষ্য বলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অনেক সময় পুঁজিপতিশ্রেণী বা তাদের পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থা বাড়তি উৎপাদনকে ফেলে দেয়, নষ্ট করে;তবুও কম দামে অভাবগ্রস্ত মানুষের কাছে সেগুলি বিক্রি করে না। এ এক ভারী মজার জিনিস। আমেরিকায় একসময় টন টন তুলো সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়েছে, কিন্তু সস্তায় জনসাধারণের কাছে বিক্রি করেনি। আমাদের দেশে যুদ্ধে র সময় গাদা গাদা জিপ, ট্রাক ভেঙে লোহা লক্কড়ে পরিণত করে লোহার দামে বিক্রি করে দিয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন অফিসার দু'একটা জিপ গোপনে বিক্রি করেছে — সেকথা আলাদা । কিন্তু আমি যেটা বলতে চাইছি, তাহ'ল এইসব জিনিস নষ্ট করে দিয়েছে, সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়েছে, তবুও সস্তায় বিক্রি করেনি, কেন? এজন্যেই করেনি যে, 'রানিং ইন্ডাস্ট্রিজ' বা চালু কলকারখানাগুলি মার খাবে। আর এটা তারা হতে দিতে পারে না। জিপ গাড়িগুলো যদি অল্প পয়সায় বা বিনি পয়সায় দিতে শুরু করে তাহলে টাটা-বিড়লার 'ইন্ডাস্ট্রি' চলবে কী করে? ফোর্ড কোম্পানি তো তাহলে ফেল মেরে যাবে। বিনা পয়সায় বা কম পয়সায় জিপ পেলে কে আর বেশি পয়সা দিয়ে জিপ কিনবে? ওরা 'প্রফিট' না রেখে, 'কস্ট অফ প্রোডাকশন'-এর ওপর হিসাব করে লাভ না রেখে মাল ছাড়বে না। এখন সেই দামে বাজারে কেনবার লোকের চেয়ে মাল বেশি হয়ে গেলে ওদের কাছে সেটা বাড়তি উৎপাদন হয়ে যায় এবং ওদের পক্ষে তা ক্রাইসিস। কাজেই বিজ্ঞানের উন্নতি, 'টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট' পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় আরও সংকট ডেকে আনছে। বিজ্ঞানের বেশি উন্নতি ঘটালে কোন্‌দিন না এক ধাক্কায় ওদের উৎপাদন ব্যবস্থাটা উল্টে যায়। তাই উৎপাদনে ওরা পারমাণবিক শক্তিকে কাজে লাগাতে পারে না। বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োগ করেই তো ওদের কাছে উৎপাদন বাড়তি হয়ে যাচ্ছে। তারপর যদি 'অ্যাটমিক এনার্জি'কে কাজে লাগাতে যায়, তাহলে তো তাদের মস্ত বড় সর্বনাশ হয়ে যাবে। তাই দেখুন, আমাদের মত পিছিয়ে পড়া পুঁজিবাদী দেশগুলোতে, আজও বৈদ্যুতিক শক্তিকেও সব জায়গায় তারা ব্যবহার করছে না — কয়লা জ্বালাচ্ছে — আরও কত কী করছে। অর্থাৎ, বৈদ্যুতিক শক্তির পুরো যে ক্ষমতা, সেই ক্ষমতার পুরো সুযোগই ওরা নিতে চায় না। কেননা নিতে গেলে উৎপাদিকা শক্তি এতো বেড়ে যাবে যে, সে অনুপাতে তাদের বাজার নেই। মানুষকে শুষে শুষে, রক্ত নিংড়ে ওরা ছিবড়ে করে ছেড়ে দিয়েছে। ওদের নির্ধারিত মূল্যে অত বেশি উৎপাদিত জিনিস কেনবার মত লোক বাজারে নেই। মানুষ আছে প্রচুর, মানুষের প্রয়োজনও প্রচুর। কিন্তু ওদের নির্ধারিত মূল্যে কেনবার বেশি লোক নেই। এটা হল এক নম্বর সমস্যা।

দ্বিতীয় সমস্যা হল, 'র‍্যাশানালাইজেশনে'র সমস্যা। মালিকরা মুনাফার স্বার্থে কারখানা খোলে। দেশের মানুষকে কাজ দেবে বলে, অন্নের সংস্থান করে দেবে বলে, বেকার সমস্যা দূর করে দেবে বলে তো আর মালিকরা কারখানা খোলে না। মালিকরা কারখানা খোলে লাভ করবার জন্য। তারা যদি দেখে যে, কোন মেশিন চালু করলে কম খরচে বেশি লাভ হয়, তাহলে, তারা বেশি মজুর নেবে না। ফলে বেকার সমস্যা আরও বাড়বে। র‍্যাশানালাইজেশন করতে গেলে মজুর ছাঁটাই হবে। তখনই "ইনক্লাব — জিন্দাবাদ", "হামারা দাবি মানতে হবে" এইসব দাবি উঠবে। উঠবেই তো। পেটে না খেতে পেলে কত আর মানুষকে লেকচার দিয়ে বোঝান যাবে। কাজেই পুঁজিপতিদের সামনে, তাদের সরকারের সামনে এ মস্ত বড় ঝামেলা। এদিক থেকে দেখলে বিজ্ঞান আজ ওদের পক্ষে এক অভিশাপ। সুতরাং, সমাজে বিজ্ঞান যতটুকু চালু আছে, সেটা পুঁজিপতিদের শ্রেণীস্বার্থ, শোষণ ও মুনাফার স্বার্থেই ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই আমরা যে আজ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বলি, রাষ্ট্রবিপ্লবের কথা বলি — সেটা কী? সেই বিপ্লবের অর্থ হ'ল মুক্তি — মালিকের শোষণ

ও জুলুম থেকে শ্রমিক-চাষীর মুক্তি, মালিকের মুনাফার চক্কর থেকে বিজ্ঞানের মুক্তি, আর পুরুষের জুলুম ও জবরদস্তি থেকে মেয়েদের মুক্তি। এইরকম নানান বন্ধন থেকে নানা দিক থেকে সকলেরই মুক্তি দরকার। মেয়েদের মুক্তি দরকার পারিবারিক বন্ধনের হাত থেকে। এখন আমরা কাজ ভাগ করে নিয়েছি। আমরা মেয়েদের বলি, 'তুমি ঘরে রান্নাবান্না কর, মশলা বাট, ছেলেমেয়েদের দেখ; আমি বাইরে থেকে রোজগার করে আনি।' এরকম একটা ভাগ আমরা করে নিয়েছি — দু'জনের দুটো আলাদা ডিপার্টমেন্ট। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনায় পরিবারগুলোকে এইরকম না রেখে নতুনভাবে গড়ে তোলা যায়। কিন্তু এখন তার উপায় নেই। তেমন করে পরিবারগুলো গড়ে তুলতে পারলে মেয়েরা বলতে পারবে — "রোজগার আমরা দু'জনেই করব। পরিবারের টুকিটাকি যা কাজ ফাঁকে-ফুঁকে দু'জনেই সেরে নেব। অফিসটাইমে ছেলেমেয়েদের দেখবার জন্য নার্সারি আছে, কিন্ডারগার্টেন আছে — তাদের সেখানে দিয়ে যাব। অফিস থেকে ফেরবার পথে তুমি অথবা আমি নিয়ে আসব। পারিবারিক কাজ তখন দু'জনেই সমানভাবে সেরে নিতে পারি। ফলে পারিবারিক দাসত্ব থেকে আমরা, মেয়েরা তখন মুক্ত হতে পারি।" আর কী? অর্থনৈতিক দাসত্ব, পুরুষের কাছে যে দাসত্ব — মেয়েদের সেই দাসত্ব থেকে মুক্তি দরকার। সমান অধিকারের ভিত্তিতে, সমান ইজ্জতের ভিত্তিতে, ভালবাসার ভিত্তিতে নরনারীর মধ্যে নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলার ভিত্তিতেই এই মুক্তি দরকার।

তাই বলছিলাম — মজুর-চাষীর সকলের মুক্তি দরকার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাসত্ব থেকে। আর বিজ্ঞানের মুক্তি দরকার পুঁজির শোষণ থেকে। এই সর্বাঙ্গীণ মুক্তির প্রয়োজনেই আমাদের এই লড়াইয়ের আয়োজন — সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াই। তাই সমাজতন্ত্র শুধু চাষী-মজুরের লড়াই নয় — মেয়েদেরও লড়াই, মানুষ মাত্রেরই লড়াই। এই সমাজতন্ত্রের লড়াই বিজ্ঞানকে পুঁজির বন্ধন থেকে মুক্ত করে সাধারণ মানুষের কাজে লাগাবার লড়াই। কিন্তু মালিকশ্রেণী, কায়েমি স্বার্থবাদীরা সমাজের প্রগতি চায় না। কারণ সমাজের যতটুকু সম্পদ আছে তাই তাদের পক্ষে প্রচুর। তারা মালিক হয়ে সমাজের সবকিছু লুটেপুটে খাচ্ছে। তাদের আমিরির অভাব নেই। তাই এ ব্যবস্থা ছেড়ে অন্য কোন ব্যবস্থায় তারা যেতে চাইছে না। কিন্তু এ ব্যবস্থায় যারা সব কিছু থেকে বঞ্চি ত, যারা শোষিত ও নিপীড়িত, এ সমাজব্যবস্থা ভাঙা দরকার তাদেরই।

সত্য জানার প্রয়োজন সর্বহারাশ্রেণীর সবচেয়ে বেশি

আজ এই পুঁজিবাদী সমাজে আমরা কী দেখছি? দেখছি যে পুঁজিবাদবিরোধী আন্দোলন, মজুর-চাষী-নিম্নমধ্যবিত্তের আন্দোলন গড়ে উঠছে — বিজ্ঞানকে, উৎপাদন ব্যবস্থাকে শোষণের 'মোটিভ' থেকে, অর্থাৎ, মুনাফার উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত করে সামাজিক প্রয়োজনে তাকে ব্যবহার করার জন্য। ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ করে উৎপাদন ব্যবস্থায় সামাজিক মালিকানা প্রবর্তনের জন্য আজ সর্বহারাশ্রেণী, অর্থাৎ, চাষীমজুরশ্রেণী চেষ্টা করছে। কাজেই তারা বর্তমান সমাজকে ভাঙতে চাইছে। ফলে এই সমাজটাকে ভেঙে নতুন সমাজ গড়ে তোলার জন্য, বিজ্ঞান এবং উৎপাদন ব্যবস্থার অব্যাহত অগ্রগতির জন্য যতটুকু সত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে তারা জেনেছে, তাতে আর তাদের চলে না। তারা চাইছে বিজ্ঞানের আরও অগ্রগতি, আরও সত্যকে জানা, দুনিয়াকে আরও ভাল করে জানা। বিজ্ঞানের শক্তি আরও বাড়ুক, উৎপাদন আরও প্রচুর হোক, মানুষ আরও বেশি ভোগ করুক, প্রত্যেক মানুষের ঘরে ঘরে বিজ্ঞানের এই দান আমরা পৌঁছে দিই — এ প্রয়োজন আজ সর্বহারার। কারণ, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাদের বাড়তি উৎপাদনের সমস্যা নেই, সমাজতান্ত্রিক দেশে মালিকি স্বার্থে বা মুনাফার উদ্দেশ্যে উৎপাদন পরিচালনা করতে হয় না। সে কারণেই বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে তাদের রুখবার প্রয়োজন নেই। সেজন্য সর্বহারাশ্রেণীই পুঁজিবাদের শৃঙ্খল থেকে আজ বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করতে চাইছে। কারণ, সত্যকে অবরুদ্ধ করে রাখলে সবচেয়ে ক্ষতি সর্বহারার। সত্যানুসন্ধান যার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, মিথ্যাচার দিয়ে যার চলে না — সে হ'ল সর্বহারাশ্রেণী। সত্যের দরকার, জ্ঞানের দরকার আজ সবচেয়ে বেশি শ্রমিক চাষী নিম্নমধ্যবিত্ত তথা সাধারণ মানুষের। কারণ, জ্ঞানের প্রদীপ ছাড়া, জ্ঞানের অস্ত্র ছাড়া, হাতিয়ার ছাড়া অজ্ঞাত সমস্যাগুলোর ভেতরে তারা রোশ্নি ফেলতে পারে না। যে সমস্ত ধোঁকাবাজি, যে সমস্ত অর্থনৈতিক রহস্য, সামাজিক রহস্য, বিভ্রান্তি ও চক্রান্তের জাল পুঁজিপতিশ্রেণী বিছিয়ে রেখেছে গোটা সমাজে, তার ফাঁসগুলো খুলতে হলে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালতে হবে। আর সে প্রদীপ বিজ্ঞান দিয়েই জ্বালা সম্ভব। তাই আজকের দুনিয়ায় বিজ্ঞানের সাধক বুর্জোয়ারা নয় — প্রলেটারিয়েটরাই। বুর্জোয়ারা গোড়ার দিকে

বিজ্ঞানের যতটা সাধক ছিল — প্রলেটারিয়েটরা তার চেয়ে বিজ্ঞানের আজ অনেক বেশি উপাসক। এই বিজ্ঞান বলতে শুধু কারিগরি বিজ্ঞান বলছি না — মানুষের চিন্তাভাবনা, মানসিক গঠন ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির দিকটার কথাই বেশি করে বলছি। কারণ, ঐ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপরই প্রলেটারিয়েটের মানসিক গঠন। প্রথম যুগে বুর্জোয়াদের ছিল তদানীন্তন ভাববাদী সমাজের ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠা মন — তার ওপরই তাদের বিজ্ঞানের জগতটাও গড়ে উঠেছিল। আমাদের এই নতুন বিজ্ঞান সাধনার যে আকাঙ্ক্ষা, যে আগ্রহ — সেটা গড়ে উঠেছে বর্তমান বাস্তব অবস্থা ও বাস্তব জীবনের ওপর ভিত্তি করে। ফলে, সর্বহারাদের ক্ষেত্রে, আমাদের ক্ষেত্রে বস্তুতান্ত্রিক চিন্তা আরও উন্নত হয়েছে, আরও 'পারফেকশনে' পৌঁছেছে। ভাববাদী দর্শনের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, যেটা নাকি মার্কসবাদের দার্শনিক বুনিয়াদ — তার জন্ম হয়েছে।

মার্কসবাদ ছাড়া অন্যান্য বস্তুবাদ ভাববাদের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়

এ প্রসঙ্গে একটি কথা আমাদের জানা দরকার। দুনিয়াতে মার্কসবাদই একমাত্র বস্তুবাদ নয়। মার্কসবাদ ছাড়াও বহু বস্তুবাদী দর্শন এসেছে। শুধু ইউরোপেই নয়, আমাদের দেশেও বহু বস্তুবাদী দর্শনের জন্ম হয়েছে। কিন্তু ঐ সব বস্তুবাদ আর মার্কসবাদ বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। মার্কসবাদ ছাড়া অন্য কোন বস্তুবাদ ভাববাদ থেকে মুক্ত নয়। যদিও তাদের মৌলিক দিকটা, মূল চিন্তার পদ্ধতি বা কাঠামো বস্তুতান্ত্রিক — তবুও তারা পুরোপুরি ভাববাদের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। বৈজ্ঞানিক নিয়মকানুন, বস্তুজগতের পুরো রহস্য ও তার নিয়মগুলো এইসব দর্শনগুলোর পক্ষে সঠিকভাবে জানা সম্ভব হয়নি। জানতে পারেনি এই জন্য যে, তাকে জানবার জন্য বিজ্ঞানের যে অগ্রগতি দরকার ছিল — বিজ্ঞানের সে অগ্রগতি সেদিন ঘটেনি। একটা স্তর পর্যন্ত বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটার আগে কোন মনীষীর পক্ষেই বস্তুজগতের সাধারণ নিয়মগুলো জানা সম্ভব ছিল না। বিষয়টা এমন নয় যে, মার্কসের আগে দুনিয়াতে তাঁর মত প্রতিভা বা জিনিয়াসের জন্ম হয়নি। এটা কোন বিচারই নয়। আসলে একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, মার্কসবাদের জন্মের পেছনে রয়েছে তৎকালীন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা, মানবতাবাদী ভাবধারা, শ্রমিকশ্রেণীর জন্ম ও তদানীন্তন বিজ্ঞানের আবিষ্কার। এইগুলোর ভিত্তিতেই মার্কসবাদের জন্ম হয়েছে, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের জন্ম সম্ভব হয়েছে।

আমরা আলোচনা করেছি, মার্কসবাদ ছাড়া অন্যান্য সমস্ত বস্তুবাদই মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে এককথায় ভাববাদ। কেন? না, অন্যান্য বস্তুবাদের চিন্তা মূলগতভাবে বস্তুবাদী হলেও — সত্যকে পুরোপুরি না জানার ফলে অন্যান্য সমস্ত বস্তুবাদে সত্যকে শাশ্বত করা হয়েছে, 'ডগ্‌ম্যাটিক' করা হয়েছে — মনগড়া ধারণার দ্বারা সত্যকে বাঁধাধরা ছকে আটকে ফেলা হয়েছে। ধারণাটা হয়তো বস্তুতান্ত্রিক — কিন্তু তা মনগড়া এবং তা পরীক্ষিত সত্য নয়। ধারণাটা মনগড়া হওয়ার ফলে এবং তাদের ধারণায় সত্য অপরিবর্তনীয় ও শাশ্বত হওয়ার ফলে — ভগবানের ধারণা যেমন অসত্য ও নিষ্ফলা, তেমনি বস্তু সম্পর্কে তাদের ধারণাও অসত্য ও নিষ্ফলা ধারণায় পরিণত হয়েছে। এখন ভগবৎ ধারণাকে নিষ্ফলা বলছি কেন? অসত্য বলছি কেন? কেননা বাস্তবের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই। ফলে, সেটা বাস্তবের সাথে সম্পর্কবিহীন এবং এই কারণেই নিষ্ফলা — যেহেতু এর দ্বারা কোন কাজ হয় না। আবার ধরুন — আমি ঈশ্বর মানি না, ভগবান-টগবান মানিনা, কিন্তু বস্তু সম্পর্কে আমার ধারণাটা অসত্য;আমি ঈশ্বর না মেনেও যদি এমন কোন ধারণা করি, যা অসত্য, অবাস্তব, তাহলে সে অসত্য ধারণার দ্বারাও আমি ভাববাদীতে পরিণত হতে পারি। ঈশ্বরধারণা বা ভাববাদী ধারণার দ্বারা আজ যেমন কোন ফললাভ হয় না, দুনিয়ার আজ আর কোন প্রগতি, অগ্রগতি এই সব ভাববাদী ধারণার দ্বারা সম্ভব নয় — তেমনি ঐ সব অসত্য বস্তুতান্ত্রিক ধারণার দ্বারাও কোন ফললাভ সম্ভব নয়। কাজেই কার্যক্ষেত্রে তা ভাববাদেরই নামান্তর — প্রায় বলতে গেলে কতগুলো অন্ধবিশ্বাসেরই ফল — কতগুলো সূত্র বা ফর্মূলা যাকে তারা শাশ্বত করে ফেলেছে। ভাববাদীরা যেমন ভাববাদ জন্ম হওয়ার পর থেকে ভগবানকে মেনে এসেছে এবং ভগবৎ চিন্তা বা আরও সঠিকভাবে বললে, ভাববাদী চিন্তার ভিত্তিতে ভাল-মন্দ, ন্যায়-নীতি গড়ে তুলেছে এবং সেগুলিকে শাশ্বত, অপরিবর্তনীয় ধারণায় পর্যবসিত করেছে — কোনও বস্তুবাদী দর্শন যদি ভগবানকে না মেনেও এই ধরনের কতগুলো শাশ্বত, অপরিবর্তনীয় ধারণা নিয়ে চলে এবং বলতে থাকে, "এইগুলো চিরকাল থাকবে", তবে সেটা বাস্তব এবং সত্যের সন্ধান দিতে পারে কি? ভগবান না মেনেও, বস্তুবাদের কথা বলেও

সে সব তো ভাববাদেরই নামান্তর।

অন্যান্য বস্তুবাদী দর্শনের দুর্বলতা

এই কারণেই ইউরোপের ফ্যুয়রবাখ এবং তারও আগে অনেক দার্শনিক এবং আমাদের দেশের চার্বাক বস্তুবাদী হয়েও ভাববাদের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি। মানুষের চিন্তা গোড়াতে বস্তুতান্ত্রিক হওয়া সত্ত্বেও বস্তু সম্পর্কে সঠিক ধারণা গড়ে না ওঠার দুর্বলতার জন্যই ভাববাদের জন্ম হয়েছে। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, মানুষের সামনে সেদিন দুনিয়াতে যে সমস্ত প্রশ্ন ভীড় করে দেখা দিয়েছিল — সে সম্পর্কে যথার্থ ধারণা বা জ্ঞানলাভ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কাজেই বস্তুকে জানতে চেয়েও, বস্তু নিয়ে ভাবতে চেয়েও, বস্তু নিরপেক্ষ কোন সত্তার ধারণা জন্ম না হওয়া সত্ত্বেও, মানুষের বুদ্ধি, বিজ্ঞান এবং উৎপাদন ব্যবস্থা ইত্যাদি যে স্তরে ছিল — অর্থাৎ, তার যে সীমাবদ্ধতা ও দৈন্য ছিল, বস্তু এবং তার গতি প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা এত পিছিয়ে ছিল যে, সেইসব ধারণা সত্যের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারেনি। আর এরই সুযোগে একটা বিশেষ বাস্তব পরিস্থিতিতে ভাববাদের জন্ম হল — যে পরিস্থিতি সম্পর্কে আগেই আলোচনা করেছি। এভাবেই বস্তুবাদ সেদিন ভাববাদের কাছে পরাজিত হ'ল।

বস্তু ও মনের পারস্পরিক সম্পর্ক

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের অনেক বস্তুবাদীও আবার তেমনি অনেক ভুল করে বসলেন। তাঁরা মনে করতেন যে, মন বলে কিছু নেই। ওটা বস্তুর ক্রিয়া, একটা 'ফিজিওলজিক্যাল অ্যাকশন' মাত্র। মন সম্পর্কে তাঁদের ধারণা ছিল যান্ত্রিক। মনেরও যে একটা শক্তি আছে, বস্তুর ওপর যে তার একটা ক্রিয়া আছে — এইটে তাঁরা মানতেন না। তাঁরা বলতেন শারীরিক ক্রিয়াটাই মনের ক্রিয়া। সুতরাং ওটা শুধু ফিজিওলজিক্যাল রিঅ্যাকশন — মানসিক ধারণা-টারণা কিছু নয়। অর্থাৎ, শরীরের যেমন মনের ওপর প্রভাব আছে — তেমনি মনেরও যে শরীরের ওপর প্রভাব বর্তমান, একটা যে আর একটার ওপর রিঅ্যাকট করে, এদের সম্পর্ক যে দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্ক, এই বাস্তব ধারণাটা সেদিন ছিল না। শরীরের অসুখ হলে মনের অবস্থা পাল্টায়; কিন্তু মনের অসুখ হলেও যে শরীরের অসুখ হতে পারে — এরকম ধারণা তাঁদের ছিল না। মনের যে একটা আপেক্ষিক স্বাধীনতা (রিলেটিভ ইনডিপেন্ডেন্স) আছে — তা তাঁরা জানতেন না, বুঝতেন না। মন শরীর থেকে আলাদা বা বিচ্ছিন্ন নয়, শরীর থেকে মনকে কখনই আলাদা করা যায় না — এ দুটোই একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত — এসবই ঠিক। কিন্তু, মনেরও যে আলাদা গতি আছে, শক্তি আছে এবং সেদিক থেকে আপেক্ষিকভাবে হলেও যে তার একটা স্বাধীনতা আছে — যাকে আমরা মনের আপেক্ষিক স্বাধীনতা বলি — এই ধারণাটা উনিশ শতকের বস্তুবাদীদের ছিল না। কারণ, শারীর বিজ্ঞানের (ফিজিওলজি), মনোবিজ্ঞানের (সাইকোলজি) তখনও তেমন উন্নতি, তেমন অগ্রগতি হয়নি। জীববিজ্ঞানে (বায়োলজিক্যাল সায়েন্স) যেসব রহস্য মানুষ আজ জানতে পেরেছে — সেদিন সেগুলো ভালভাবে জানা যায়নি। ফলে মনের গতিপ্রকৃতি কী — বিজ্ঞানের সেই স্তরে মানুষ তা বুঝতে পারেনি। তার ফলে বিপত্তি ঘটেছে অনেক।

আদর্শও পরিবর্তনশীল

যেমন ধরুন, ফ্যুয়রবাখ ভগবান মানলেন না — হেগেলের যে নির্বিশেষ ভাব (অ্যাবসলিউট আইডিয়া) তাকে তিনি উড়িয়ে দিলেন। বস্তুজগতকে তিনি বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করলেন, এমনকী দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়াতেই যে এই বস্তুজগতের সমস্ত পরিবর্তন হচ্ছে — এসব কথা বললেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত 'মরাল কোড', কতগুলো 'এথিক্যাল প্রিন্সিপ্‌ল', অর্থাৎ, নীতিনৈতিকতা সংক্রান্ত কতগুলো শাশ্বত ধারণা তুলে ধরলেন। হিউম্যানিজম্ বা মানবতাবাদী ভাবনাধারণার ভিত্তিতে কতগুলো রুচি, নীতি, আদর্শকে তিনি অপরিবর্তনীয় ও শাশ্বত বললেন, মানুষের প্রগতি ও সমাজের পরিবর্তন ও উন্নতির জন্য এই শাশ্বত নীতিগুলো দরকার — এইভাবেই ভাবতে শুরু করলেন। সমাজের অগ্রগতির সাথে সাথে, তার বাস্তব প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়েই যে, নীতিনৈতিকতা, আদর্শ পাল্টায় এবং পাল্টাতে বাধ্য — এই সত্য ফ্যুয়রবাখ ধরতে

পারলেন না এবং এটা না পারার জন্যই তিনি এইভাবে নীতি ও আদর্শকে চিরন্তন করে তুললেন। এখানেই তাঁর বিচ্যুতি ঘটলো। আদর্শেরও যে জন্ম-মৃত্যু আছে, মানুষের প্রয়োজনে, সমাজের অর্ন্তদ্বন্দ্বের ফলে, মানুষের মন ও পারিপার্শ্বিকের সাথে সংঘাতের মধ্য দিয়ে আদর্শের যে পরিবর্তন হয় — একথাটা তিনি বুঝলেন না। তিনি বুঝলেন না যে, একটা বিশেষ সমাজে একটা বিশেষ অবস্থায় একটা বিশেষ আদর্শ জন্ম নেয় এবং বেঁচে থাকে, আবার একটা নতুন সমাজে গিয়ে সে আদর্শের মৃত্যু হয় এবং নতুন আদর্শের জন্ম হয়। সুতরাং, আদর্শও পরিবর্তনশীল এবং গতিশীল (ডায়নামিক)। আর চলমান এই জগতে তার পরিবর্তনের, তার বিকাশের একটা পদ্ধতি আছে। ফ্যুয়রবাখ দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দৃষ্টিতে বস্তুজগতকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েও এই বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করলেন। ফলে বস্তুবাদী দর্শন প্রচার (প্রিচ) করেও তিনি বাস্তবে ভাববাদী হয়ে পড়লেন।

মার্কস এসে ফ্যুয়রবাখের মানবতাবাদকে খণ্ডন করলেন এবং দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে একটা পূর্ণাঙ্গ এবং সামগ্রিক দর্শন, অর্থাৎ, বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা ও বিচার-বিশ্লেষণ পদ্ধতি হিসাবে, একটা সামগ্রিক বিজ্ঞান হিসাবে খাড়া করলেন। এ জায়গায় ভুল না করলে ফ্যুয়রবাখই ইতিহাসে হয়তো মার্কসের জায়গা নিতে পারতেন। আজ দুনিয়াজোড়া মার্কসবাদী আন্দোলনের যে কৃতিত্ব এবং গৌরব, ফ্যুয়রবাখের নামই তার সাথে যুক্ত হতে পারতো। কিন্তু সেটা ঘটলো না। ফ্যুয়রবাখ যেখানে ভুল করেছিলেন, 'স্লিপ' করেছিলেন, মার্কস সেই ভুল করলেন না। তিনি সমস্ত বিষয়টাকে 'ব্যালান্স' করতে সক্ষম হলেন, গোটা বিষয়টাকে ঠিক ঠিক ভাবে সংযোজিত করতে সক্ষম হলেন। এইভাবেই তিনি গোটা বস্তুবাদী দর্শনকে একটা দৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করলেন।

ভাববাদী ও বস্তুবাদী দর্শনের বিকাশ

তাহলে আমরা কী দেখলাম? না, শ্রেণীবিভক্ত সমাজের শুরু থেকেই ভাববাদী চিন্তা ও বস্তুবাদী চিন্তা পাশাপাশি চলে এসেছে এবং বিকাশ লাভ করেছে। আদিম ভাববাদ বিকাশ লাভ করতে করতে এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থায় পৌঁছেছে। হিন্দু ধর্মে এক সময় তেত্রিশ কোটি দেবতার জন্ম হ'ল। তারপর সেটা কমতে কমতে এক ঈশ্বর, নিরাকার ব্রহ্ম এবং আরও এগিয়ে গিয়ে ভাববাদীরা এমনকী বৈজ্ঞানিক মায়াবাদের (সায়েন্টিফিক মিসটিসিজম্) জন্ম দিলেন। এই বৈজ্ঞানিক মায়াবাদ ভাববাদী দর্শন হলেও সেখানে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে মেনে নেওয়া হয়নি। ভাববাদীরা তখন এরকম জায়গায় এসে গেছেন। এইভাবেই ভাববাদী চিন্তার বিকাশ ঘটতে ঘটতে এই জায়গায় এসেছে। আবার এর পাশাপাশি বস্তুবাদী দর্শনের পরিবর্তনকেও মিলিয়ে দেখুন। আদিম বস্তুবাদী চিন্তা উন্নত হতে হতে, বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে উন্নত হতে হতে, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর যান্ত্রিক বস্তুবাদ বা 'মেকানিক্যাল মেটিরিয়ালিজম্'-এ এসে পৌঁছালো। আমি আগেই বলেছি যে, নিউটনের বিজ্ঞান তথা 'নিউটোনিয়ান ফিজিক্স' বিজ্ঞানকে অনেকখানি উন্নত করতে সক্ষম হলেও বিজ্ঞানের কতগুলো সীমাবদ্ধতার জন্য, বস্তুর চরিত্রকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে না পারায় দর্শনের ক্ষেত্রে বস্তবাদী চিন্তাকে ভাববাদী প্রভাব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করতে পারেনি। ফলে যান্ত্রিক বস্তুবাদের জন্ম হ'ল। কিন্তু, পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি ঘটার ফলে, বস্তু সম্পর্কে নতুন ধারণার ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে শ্রেণীসংগ্রামের নতুন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ করে ডারউইনের গবেষণার দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েই মার্কসবাদের জন্ম হ'ল — যান্ত্রিক বস্তুবাদের স্তর থেকে উন্নীত হয়ে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে এসে আমরা পৌঁছালাম।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদও একটা বিজ্ঞান

তাহলে, আমরা এইভাবেই বস্তুজগতের কতকগুলো সাধারণ সত্য জানতে পারলাম। এইসব সত্যকে, সাধারণ নীতি ও নিয়মগুলোকে মানুষ জানতে চেয়েছে। ভাববাদীরা বস্তুবাদীরা সকলেই জানতে চেয়েছে — জানার চেষ্টা করেছে। কিন্তু বারবারই কিছু জেনেছে, আংশিক জেনেছে, ছিটেফোঁটা জেনেছে আর বাকিটা মনগড়া ধারণা দিয়ে একটা ছক কেটে মানুষের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। কিন্তু দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদই প্রথম দর্শন যা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ওপর, বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপর, প্রমাণিত সত্যের ওপর সত্যিসত্যিই জানতে পেরেছে

— বস্তুজগতের চলার নিয়ম কী, বস্তুর পরিবর্তন হয় কীভাবে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের কোন কথাই মনগড়া নয়, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেসব সত্য প্রমাণিত সত্য হিসাবে গড়ে উঠেছে, সেই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষালব্ধ সত্যগুলোকে একত্র করে, সংযোজিত করেই তার দার্শনিক কাঠামোটা গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ, ফিজিক্স্, কেমিস্ট্রি, ম্যাথামেটিক্স্, বায়োলজিক্যাল সায়েন্স্, সোসিয়োলজি, ইকনমিক্স্ প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আলাদা আলাদা যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়, সেইসব পরীক্ষালব্ধ সত্য বা জ্ঞানকে 'কো-অর্ডিনেট' করে যে সাধারণ সত্য গড়ে ওঠে, সেগুলোই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ভিত্তি। সেজন্যই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদও একটি বিজ্ঞান। বিষয়টা আর একটু পরিষ্কার হওয়া দরকার। অর্থাৎ, আমি বলতে চাইছি, ফিজিক্স্ বা পদার্থবিদ্যা কী করছে? বস্তুর গতির নিয়ম, শক্তির নিয়মকে 'স্টাডি' করছে, জানার চেষ্টা করছে। কেমিস্ট্রি বা রসায়নশাস্ত্র কী করছে? বস্তুর রাসায়নিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াগুলোকে স্টাডি করছে, জানার চেষ্টা করছে, তার নিয়মকানুনকে অনুধাবন করার চেষ্টা করছে। এইরকমভাবে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগগুলো বস্তুর নিয়ম, গতিপ্রকৃতিকে আলাদা আলাদা ভাবে জানার চেষ্টা করছে। আর দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, যাকে নিজেই একটা বিজ্ঞান বলে বলছি — সে কী করছে? কী স্টাডি করছে? বস্তুর সেই সাধারণ নিয়মগুলো — যেগুলো নাকি ফিজিক্স্, কেমিস্ট্রি, ম্যাথামেটিক্স, অর্থাৎ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগগুলো মেনে চলে, মার্কসবাদ বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ সেই সাধারণ নিয়মগুলোকেই জানছে। অর্থাৎ 'ডায়ালেকটিক্যাল মেটিরিয়ালিজম্ স্টাডিজ দি জেনারেল ল'স হুইচ গভার্ন দি এন্টায়ার অ্যাকটিভিটি অফ দি মেটিরিয়াল ওয়ার্ল্ড।' সুতরাং, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগগুলো বস্তুজগতের বিশেষ বিশেষ দিককে আলাদা করে জানছে, স্টাডি করছে — আর দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ এই বিভিন্ন সত্যগুলোকে সংযোজিত করে পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়ে কতকগুলো সাধারণ সত্যে উপনীত হচ্ছে — যে সাধারণ সত্যগুলো বস্তুজগত ও বিজ্ঞানের সমস্ত ক্রিয়াকলাপকে পরিচালিত করছে, কনডাক্ট করছে। অর্থাৎ, যে মূল নিয়মের বাইরে বস্তুজগত চলতে পারে না, অবস্থান করতে পারে না — সেই মূল নিয়ম বা সাধারণ সত্যকে জানাই হচ্ছে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের কাজ। পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র বিজ্ঞানের এই বিশেষ বিশেষ বিভাগগুলো যেখানে বস্তুজগতের বিশেষ নিয়ম, বিশেষ বিশেষ কার্যকলাপকে জানছে, স্টাডি করছে বা 'গভার্ন' করছে — সেখানে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বিজ্ঞানের এই সমস্ত বিভাগের এবং সেই দিক থেকে বস্তুজগতের সমস্ত মূল নিয়মকে, সাধারণ নিয়মগুলোকে জানছে, স্টাডি করছে বা গভার্ন করছে। এই অর্থে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদই একমাত্র দর্শন যেটা পুরোপুরি বিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল এবং নিজেই একটি বিজ্ঞান। আর এইখানেই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ অন্যান্য সমস্ত দর্শন থেকে আলাদা।

বিজ্ঞান থেকে, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ থেকে, আমরা আজ একটি স্থির সিদ্ধান্ত জানতে পেরেছি। সেটা হচ্ছে, বস্তুজগতের বাইরে কিছু অবস্থান করে না। দুনিয়াতে এমন কোন কিছুর অস্তিত্ব কেউ দেখাতে পারবেন না, যেটার অবস্থান বস্তুজগতের বাইরে, যা বস্তুজগতের সাথে সম্পর্কহীন। এই যে ঈশ্বর বা ভগবানের ধারণা বা চিন্তা, সেই ভগবৎ চিন্তাও এসেছে একটা বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতিকে ভিত্তি করে, কতগুলো সাদৃশ্য দেখে, অজ্ঞতাবশত ভুলভাবে তুলনা করে — যেটা আমি ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। যে ঈশ্বর চিন্তা ভুল এবং অসত্য, সত্যিকারের বিজ্ঞানের জন্ম না হওয়ার জন্য সেই ঈশ্বরকে বস্তুজগতের সৃষ্টিকর্তা বলে যেখানে এতদিন ধরে নেওয়া হয়েছে — সেখানে বিজ্ঞান বলছে যে, আসলে একটা বিশেষ বাস্তব পরিস্থিতিতে এই ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। যে মন বা ভাবকে অনেকে বস্তুবহির্ভূত সত্তা বলে মনে করেন, সেই মন কিন্তু বস্তুর ক্রিয়ার ফল। বিজ্ঞান বলছে, 'মাইন্ড ইজ দি পার্টিকুলার ফাংশন অফ দি হিউম্যান ব্রেন'। অর্থাৎ, মানুষের মস্তিষ্কের বিশেষ ক্রিয়ার ফলই হচ্ছে মন। আর আমরা জানি যে, মানুষের এই মস্তিষ্ক বস্তুদ্বারা গঠিত। সুতরাং ভগবানকে যে মানুষ চিন্তা করছে, যে মন চিন্তা করছে — যা দিয়ে এই ভগবৎ চিন্তা করছে, সেটা হচ্ছে মানুষের মস্তিষ্ক। আর মানুষের সেই মস্তিষ্কই বস্তুদ্বারা গঠিত। তাই বলা হয়, মানুষের মস্তিষ্ক, মানে বস্তুই ভগবৎ চিন্তা করছে এক বিশেষ অবস্থায় পড়ে, যে অবস্থায় মানুষের বিভ্রান্ত হবার মত যথেষ্ট কারণ বর্তমান ছিল। আজকে যেমন পুঁজিপতিরা নানান জিনিস বোঝায় — আপনারা কি সেসব বিশ্বাস করেন? আমরা জানি, আপনারাও জানেন, সেসব কথা সত্যি নয়। কিন্তু একথা তো ঠিক যে, এইসব প্রচারের দ্বারা কিছু মানুষ বিভ্রান্ত হয়, অসত্যকে সত্য বলে মেনে নেয়। তারা এইভাবে বিভ্রান্ত হচ্ছে কেন? কারণ বিভ্রান্ত হবার মত আজ পারিপার্শ্বিক অবস্থা যথেষ্ট মজুত। এই কারণেই সেইসব মানুষগুলোর বিভ্রান্ত হবার সুযোগ রয়েছে। তেমনি বিভ্রান্ত হবার উপযুক্ত পরিস্থিতি

থাকার ফলেই ভগবৎ ধারণা বা ঈশ্বরবাদের জন্ম। নাহলে বিষয়টা এমন নয় যে, ঈশ্বর একটা বস্তুবহির্ভূত সত্তা হিসেবে দুনিয়াতে অবস্থান করে। বিজ্ঞান বলছে, আমরা যা কিছু দেখছি সবই বস্তুর দ্বারাই সৃষ্টি — বস্তুর বাইরে কিছু নেই। বস্তু থেকে বস্তু, বস্তু থেকেই বস্তুজগতের সৃষ্টি। তাই বস্তুর বাইরে আমরা কিছু চিন্তা করতে পারি না, কল্পনা করতে পারি না। এটাই বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্য।

নিছক জানা নয়, দুনিয়াকে পরিবর্তন করাই মার্কসবাদের কাজ

তাহলে আমরা দেখলাম, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ একদিনে গড়ে ওঠেনি। মার্কসবাদ বা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ গড়ে ওঠার পেছনে রয়েছে এক দীর্ঘ ইতিহাস। সমাজের বস্তুতান্ত্রিক চিন্তা ধাপে ধাপে উন্নত হতে হতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি, উৎপাদন ব্যবস্থার অগ্রগতি সমাজব্যবস্থার নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এবং মানব-ইতিহাসের সঞ্চি ত জ্ঞানের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে, কতগুলো সাধারণ সত্যের ওপর, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষালব্ধ নিয়মের ভিত্তিতেই মার্কসবাদ ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ গড়ে উঠেছে। অন্য দর্শনের সাথে এর পার্থক্য এই যে, এ বিজ্ঞানভিত্তিক, কাজেই বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং বৈজ্ঞানিক সত্যকে অস্বীকার ক'রে বস্তুনিরপেক্ষ সত্তার সন্ধান সে করে না। বস্তুনিরপেক্ষ সত্তা — যার কোন অস্তিত্ব নেই — তাকে এ স্বীকার করে না। এর মতে দর্শনের কাজ, জ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্য হচ্ছে, শুধু দুনিয়াকে জানা নয়, শুধু ব্যাখ্যা করা নয়, দুনিয়ায় প্রতি মুহূর্তে যে পরিবর্তন হচ্ছে, সমাজে যে পরিবর্তন হচ্ছে, সেই পরিবর্তনের নিয়ম উপলব্ধি করে তার ভিত্তিতে সেই পরিবর্তনের ছন্দে প্রভাব বিস্তার করা সেই পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করা, পরিবর্তিত জগতকে আরও পরিবর্তিত হতে সাহায্য করা এবং দুনিয়াকে আরও পাল্টানো। এই হ'ল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ গড়ে ওঠার খুবই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এরপর আমরা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের কয়েকটি দিক সম্পর্কে, বস্তু সম্পর্কে আজ ধারণা কী এবং তার পরিবর্তনের নিয়মগুলোই বা কী, সেই সংক্রান্ত কিছু আলোচনা করব।

আধুনিক বিজ্ঞানে বস্তু সংক্রান্ত ধারণা

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মতে বস্তুজগতই একমাত্র সত্য। বস্তু থেকেই সবকিছুর সৃষ্টি। এই বস্তু নির্বিশেষ বস্তু, তার গোড়াও নেই, শেষও নেই। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ বস্তুর সমন্বয়ে বস্তুর যে সামগ্রিক রূপটি গড়ে উঠেছে, যা সর্বব্যাপক এবং সর্বজনীন (ইউনিভার্সাল) — যার ভিত্তিতেই আমাদের বস্তুধারণা (ম্যাটার কনসেপ্ট) গড়ে উঠেছে সেই বস্তুকেই আমি নির্বিশেষ বস্তু বলছি। এ বস্তু দার্শনিক বস্তু, দর্শনের পরিধিকেই (ফিলজফিক ক্যাটিগরি) সূচিত করে। একে কেউ সৃষ্টি করেনি, এ স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই বস্তুজগৎও স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু বস্তু, বস্তুজগৎ নিয়ত পরিবর্তনশীল। প্রতি মুহূর্তেই তার মধ্যে পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে, ক্রমাগত বিকাশ হচ্ছে। আর আমাদের এই বস্তু দ্বন্দ্বমূলক বস্তু (ডায়ালেকটিক্যাল ম্যাটার)। এই বস্তুজগতের বৈশিষ্ট্য হল, যা কিছু যেখানে অবস্থান করছে — যার নিজের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব রয়েছে এবং তার সঙ্গে তার পারিপার্শ্বিকের বহির্দ্বন্দ্ব রয়েছে। এই দুই দ্বন্দ্বের মধ্যে, বস্তুর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের মধ্যে, বস্তু সর্বদা আবর্তিত হচ্ছে। এই হচ্ছে বস্তুর অবস্থানের বৈশিষ্ট্য, এই হচ্ছে বস্তুর চরিত্র। আমাদের বস্তু জড় বস্তু নয়, মেকানিক্যাল বস্তু নয়, যান্ত্রিক বস্তু নয়, স্থানুর মত অচল, অপরিবর্তনীয় বস্তু নয়। এ হচ্ছে ডায়নামিক বস্তু, সচল বস্তু, দ্বান্দ্বিক বস্তু (ডায়ালেকটিক্যাল ম্যাটার)। অর্থাৎ, এটা সেই বস্তু, যার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্ব রয়েছে এবং যে দ্বন্দ্বই তাকে গতিশীল, পরিবর্তনশীল করেছে। এ বস্তু নিয়ত পরিবর্তনশীল, নিয়ত গতিশীল — কোথাও এক জায়গায় থেমে নেই। আমরা দেখতে পাই বা না পাই সর্বত্র এবং প্রতিমুহূর্তে বস্তুজগতের পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিবর্তনের গতিছন্দ কোথাও দ্রুত, কোথাও শ্লথ। প্রতি মুহূর্তের এই পরিবর্তন এত ধীর গতিতে হচ্ছে যে, বাইরে থেকে তাকে আমরা দেখতে পাই না। মনে হয়, জিনিসটা একজায়গাতে, একই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু আসলে বিষয় বা ঘটনাটা তা নয়। জিনিসটা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। প্রতিনিয়ত, প্রতিমুহূর্তে সর্বক্ষেত্রে এই পরিবর্তন হচ্ছে।

আর এই পরিবর্তনের মধ্যে আমরা কতগুলো নিয়ম দেখতে পাই। সেই নিয়মগুলো কী কী? দুনিয়াতে যেখানে যা কিছু পরিবর্তন হচ্ছে, বস্তুর সমস্ত কার্যকলাপের মধ্যে সর্বত্র তিনটি মূল নিয়ম আমরা দেখতে পাই। বস্তুর সমস্ত পরিবর্তন এই তিনটি মূল নিয়ম (থ্রি প্রিন্সিপ্‌ল্‌স)-এর দ্বারা পরিচালিত (গাইডেড)। সেই

তিনটি মূল নিয়ম কী কী?

(১) 'ফ্রম কোয়ান্‌টিটেটিভ চেঞ্জ টু কোয়ালিটেটিভ চেঞ্জ অ্যান্ড ভাইসি ভারসা' — পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তন, আবার গুণগত পরিবর্তন পরবর্তী পরিমাণগত পরিবর্তনকে সাহায্য করে। এই প্রক্রিয়াটা হল ধীরে ধীরে পরিবর্তন, পরিমাণগত পরিবর্তন, ক্রমপরিবর্তন হতে হতে সম্পূর্ণরূপে একটা নতুন জিনিসের জন্ম দেওয়া। প্রতিটি বস্তুর মধ্যে প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার মৌলিক রূপটা পাল্টে যাচ্ছে না। প্রতি মুহূর্তের এই পরিবর্তন সত্ত্বেও যতক্ষণ পর্যন্ত সেই বস্তুর মৌলিক চরিত্রের কোন পরিবর্তন হয় না — ততক্ষণ সেই পরিবর্তনকে আমরা পরিমাণগত পরিবর্তন বলি। কিন্তু যখনই এই পরিমাণগত পরিবর্তন হতে হতে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যখন বস্তুর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যটাই পাল্টে যায় বা একটা নতুন বস্তুতে পরিণত হয় — তখনই আমরা তাকে গুণগত পরিবর্তন, মৌলিক পরিবর্তন, বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ইত্যাদি বলি। ফলে, পুরনো বস্তুর সঙ্গে তার ঐতিহাসিক সংযোগ থাকে, কিন্তু চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে মৌলিক পার্থক্য ঘটে যায় — সেদিক থেকে কোন মিল বা সংযোগ খুঁজে পাওয়া যায় না। মোটামুটি সংক্ষেপে বলতে হলে এটাই হল 'কোয়ানটিটেটিভ চেঞ্জ টু কোয়ালিটেটিভ চেঞ্জ অ্যাণ্ড ভাইসি ভারসা' কথাটার অর্থ।

(২) 'ইউনিটি অফ অপোজিট্‌স্' — একথাটার অর্থ হচ্ছে পরস্পরবিরোধী শক্তির ঐক্য। বস্তুর মধ্যে যেমন দ্বন্দ্ব চলছে, সংঘর্ষ চলছে — এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই বস্তুর আর একটা রূপ দেখি, সেটা হল, সমন্বয়ের রূপ, মিলনের রূপ। অর্থাৎ, দ্বন্দ্বের মধ্যে মিলনেরও চরিত্রটা রয়েছে। যেখানে পরস্পরবিরোধী শক্তি পরস্পরবিরোধী দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ, বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব নিয়ে অবস্থান করছে — একটা আর একটাকে উচ্ছেদ করতে চাইছে, তারাও একটা বিশেষ অবস্থায় এই উচ্ছেদ করার আগে পর্যন্ত দ্বন্দ্বের এই পরস্পরবিরোধী রূপ সত্ত্বেও মিলিতভাবে অবস্থান করছে, বাস করছে। এই নিয়মের ভিত্তিতেই আমাদের পরিবর্তন, প্রতিদিনের পরিবর্তন রূপায়িত হচ্ছে। পরিবর্তনের ছন্দে সংঘর্ষের মধ্যে মিলনের এই রূপ এবং চরিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই নিয়মের বাইরে আমরা কেউ যেতে পারি না — এই নিয়ম না মেনে চলার উপায় নেই। সর্বত্রই এই নিয়ম আমরা দেখতে পাই।

(৩) 'নিগেশন অভ দি নিগেশন' — বিকাশের পথে অবলুপ্তি, অবলুপ্তির পথে বিকাশ। সমাজের ক্ষেত্রে, বস্তুজগতের ক্ষেত্রে, সর্বক্ষেত্রেই বিকাশ এবং পরিবর্তনের এটাই নিয়ম। বস্তুজগতের ক্রমাগত বিকাশ হচ্ছে, এই বিকাশের উপায় কী? না, ক্রমাগত নিজেকে, নিজের অস্তিত্বকে লয় করার মধ্য দিয়ে, ধ্বংস করার মধ্য দিয়েই নতুনের জন্ম হচ্ছে; নিয়ত (কনস্ট্যান্ট) ধ্বংসের মধ্য দিয়েই নতুনের সৃষ্টি। নিত্য নতুনভাবে নিজেকে ক্ষয় করা এবং সেই পথেই নতুনের জন্ম দেওয়া।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বস্তুজগতের নিয়মকানুন ও কার্যকলাপের ক্ষেত্রে আমরা এই তিনটি মূল নিয়ম লক্ষ্য করছি। বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্য হিসাবেই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বস্তুর পরিবর্তনের এই তিনটি মূল নিয়মকে গ্রহণ করেছে। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ প্রমাণ করে দেখিয়েছে, বস্তুজগতের পরিবর্তনের সমস্ত ক্ষেত্রেই এই তিনটি মূল নিয়ম প্রযোজ্য। আপনাদের আর একটা কথা জানা দরকার। এই যে দ্বন্দ্ব নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, সেই দ্বন্দ্বও দুই প্রকার। বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব ও মিলনাত্মক দ্বন্দ্ব। যেখানে দ্বন্দ্বের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে — একে অপরকে উচ্ছেদ করা, তাকে আমরা বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব বলি। মজুর এবং মালিকের মধ্যে যে লড়াই, সে লড়াইয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে একে অপরকে দমিয়ে দেওয়া, একে অপরকে উচ্ছেদ করা। আবার মজুরে মজুরে যে দ্বন্দ্ব — সেই দ্বন্দ্বের উদ্দেশ্য হচ্ছে একে অপরকে জয় করা, বোঝানো, নিজেদের মধ্যে ঐক্যকে 'সিমেন্ট' করা। এই দ্বন্দ্বকে আমরা বলি মিলনাত্মক দ্বন্দ্ব। শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তার মূল নীতি হচ্ছে আত্মসমালোচনা, তার মধ্য দিয়ে পার্টিকে শক্তিশালী করা, পার্টির ঐক্যকে সুদৃঢ় করা, ঐক্যকে সিমেন্ট করা।

এখন বস্তুর পরিবর্তনের তিনটি মূল নিয়ম সম্পর্কে আলোচনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করতে আমি বাধ্য হলাম। এ আলোচনা অনেক বিশদভাবে আগেও অনেকে শুনেছেন, সময়াভাবের জন্যই এই আলোচনা আমি সংক্ষিপ্ত করতে বাধ্য হচ্ছি। শুধু তাই নয়, মার্কসবাদ ও মানবসমাজের বিকাশ সম্পর্কে আমি যতটুকু আলোচনা করলাম, সেটাও অত্যন্ত প্রাথমিক ও সংক্ষিপ্ত। জ্ঞানতত্ত্বের বিভিন্ন দিক এবং বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার নিয়ে আলোচনা

করার সুযোগ এখানে নেই। তবুও আপনাদের যা প্রশ্ন আছে, সেগুলো রাখবেন। কৃষক ও খেতমজুর ফেডারেশনের এই সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে আমি বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির পটভূমিতে সংগঠন সংক্রান্ত কিছু আলোচনা করব। প্রথম অধিবেশনের আলোচনা, অর্থাৎ, মার্কসবাদ ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ গড়ে ওঠার সংক্ষিপ্ত আলোচনা আজ এখানেই শেষ করলাম।

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ভাটপাড়ায় অনুষ্ঠিত ‘পশ্চিমবঙ্গ কৃষক ও খেতমজুর ফেডারেশনে’র ১০ বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে ১৯৬০ সালের ১৮ জুন অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক শিক্ষাশিবিরে প্রদত্ত ভাষণ। ১৯৮২ সালের আগস্ট মাসে পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত।